بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড- 11 / সংখ্যা-34-35

সাপ্তাহিক

বদর

কাদিয়ান

Weekly
BADAR Qadian
Bangla

বাৎসরিক সাবস্ক্রিপশন
৬০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

www.akhbarbadr.in

বৃহস্পতিবার 20-27 Aug 2026   6-13 রবিউল আওয়াল 1448 A.H

মহান আল্লাহ্‌র বাণী
সৃষ্টিজগতের প্রতি সহানুভূতি

وَاعۡبُدُوا اللّٰہَ وَلَا تُشۡرِکُوۡا بِہٖ شَیۡئًا وَّبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِی الۡقُرۡبٰی
وَالۡیَتٰمٰی وَالۡمَسٰکِیۡنِ وَالۡجَارِ ذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡجَارِ الۡجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ
وَابۡنِ السَّبِیۡلِ ۙ وَمَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ مَنۡ کَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا

অনুবাদ: এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর- পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীগণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদৌ ভালবাসেন না যাহারা অহংকারী, দাম্ভিক।

[সূরা নিসা, আয়াত: ৩৭]

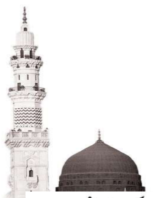

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হে আদমসন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার খোঁজখবর নিতে আসনি।

عَنۡ أَبِي هُرَيۡرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ: يَا ابۡنَ آدَمَ، مَرِضۡتُ فَلَمۡ تَعُدۡنِي، قَالَ يَا رَبِّ: كَيۡفَ أَعُودُكَ وَأَنۡتَ رَبُّ الۡعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمۡتَ أَنَّ عَبۡدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمۡ تَعُدۡهُ؟ أَمَا عَلِمۡتَ أَنَّكَ لَوۡ عُدۡتَهُ لَوَجَدۡتَنِي عِنۡدَهُ؟ يَا ابۡنَ آدَمَ، اسۡتَطۡعَمۡتُكَ فَلَمۡ تُطۡعِمۡنِي، قَالَ يَا رَبِّ: وَكَيۡفَ أُطۡعِمُكَ وَأَنۡتَ رَبُّ الۡعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمۡتَ أَنَّهُ اسۡتَطۡعَمَكَ عَبۡدِي فُلَانٌ؟ فَلَمۡ تُطۡعِمۡهُ، أَمَا عَلِمۡتَ أَنَّكَ لَوۡ أَطۡعَمۡتَهُ لَوَجَدۡتَ ذَلِكَ عِنۡدِي؟ يَا ابۡنَ آدَمَ، اسۡتَسۡقَيۡتُكَ فَلَمۡ تَسۡقِنِي، قَالَ يَا رَبِّ: كَيۡفَ أَسۡقِيكَ وَأَنۡتَ رَبُّ الۡعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسۡتَسۡقَاكَ عَبۡدِي فُلَانٌ، فَلَمۡ تَسۡقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوۡ سَقَيۡتَهُ وَجَدۡتَ ذَلِكَ عِنۡدِي؟

(مسلم کتاب البر والصلۃ باب فضل)

হে আদমসন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার খোঁজখবর নিতে আসনি। তখন বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কীভাবে তোমার সেবা-শুশ্রূষা করতাম, যখন তুমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক? আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তার খোঁজ নিতে যাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তার খোঁজ নিতে যেতে, তবে সেখানে আমাকে পেতে?

হে আদমসন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাওনি। তখন আদমসন্তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কীভাবে তোমাকে খাদ্য খাওয়াতাম, যখন তুমি সমগ্র জগতের প্রতিপালক? আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার কি মনে নেই যে আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খাদ্য খাওয়াতে, তবে তার প্রতিদান আমার নিকট পেতে?

হে আদমসন্তান! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। তখন আদমসন্তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কীভাবে তোমাকে পানি পান করাতাম, যখন তুমিই সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তবে তার প্রতিদান আমার নিকট পেতে।

[সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ]

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হও

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"এ কথাটিও ভালোভাবে স্মরণে রেখো যে, আল্লাহ তাআলার দুটি নির্দেশ রয়েছে। প্রথমত, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না-না তাঁর সত্তায়, না তাঁর গুণাবলিতে এবং না তাঁর ইবাদতে। দ্বিতীয়ত, সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও সদাচরণ কর। অনুগ্রহ বলতে শুধু নিজের ভাই বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই বোঝায় না; বরং সে যে-ই হোক-আদমসন্তান হোক এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হোক। এ কথা মনে করো না যে, সে হিন্দু না খ্রিস্টান।

আমি তোমাদের সত্য করে বলছি, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ন্যায়বিচারের বিষয়টি নিজের হাতে নিয়েছেন। তিনি চান না যে, তোমরা নিজেরাই তার বিচার করো। তোমরা যত বেশি নম্রতা, বিনয় ও নম্র আচরণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা ততই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

তোমাদের শত্রুদের ব্যাপার আল্লাহ তাআলার ওপর ছেড়ে দাও। কিয়ামত নিকটবর্তী। শত্রুরা তোমাদের যে কষ্ট দেয়, তাতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। আমি দেখছি, এখনও তাদের কাছ থেকে তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। কারণ যারা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যায়, তাদের জিহ্বা এমনভাবে চলতে থাকে, যেমন কোনো বাঁধ ভেঙে গেলে প্রবল বন্যার স্রোত বেরিয়ে আসে। অতএব, একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির উচিত নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা।"

(আল-হাকাম, ২৪ জানুয়ারি ১৯০৭; মালফুযাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩০)

তফসীরে কবীর

পুণ্যের সেই উচ্চতম স্তরও অর্জন করো, যাতে সমগ্র মানবজাতিকে তোমাদের নিজের সন্তানের মতো মনে হয়

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা আন-নাহল-এর ৯১ নম্বর আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন:

"ইহসান (অনুগ্রহ) করার সময় মানুষের মনে এ চিন্তা আসতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে, তাই আমিও তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব, যাতে আমার সুনাম হয়। অথবা কোনো অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার সময় এ ধারণা আসতে পারে যে, আমি যদি তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করি, তবে তার হৃদয় থেকে বিদ্বেষ দূর হবে এবং সে আমার বন্ধু হয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধি করবে।

কিন্তু একজন মা যখন নিজের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তখন তার মনে সামান্যতমও প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বরং তার ভালোবাসার ভিত্তিই হলো তার আত্মত্যাগ।

যখন কোনো নারীর সন্তান থাকে না, তখন তার মনে এ চিন্তা জাগে না যে, আমার যদি একটি ছেলে থাকত, তবে সে আমার সেবা করত। বরং তার সন্তানের আকাঙ্ক্ষা এ অনুভূতি নিয়ে হয় যে, আমি তাকে লালন-পালন করতাম, তার সেবা করতাম, তাকে পোশাক পরাতাম, তার বিবাহ দিতাম এবং তার সন্তানদেরও আদর-যত্ন করতাম। মোটকথা, সন্তান কামনা করার সময় একজন মায়ের অন্তরে সন্তানের কাছ থেকে সেবা পাওয়ার সামান্যতম অনুভূতিও থাকে না। বরং সেই আকাঙ্ক্ষার মূল কারণই হলো সন্তানের সেবা করার আগ্রহ।

এটাই সেই পুণ্যের চেতনা, যা মানুষের জন্য সর্বোচ্চ পুণ্য। আর এই গুণ অর্জিত হলে মানুষের নৈতিক সত্তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যখন ইহসানের স্তরে পৌঁছে যাও-যেখানে গ্রহণ করার চেয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই বেশি থাকে-তখন পুণ্যের সেই উচ্চতম স্তরও অর্জন করো, যাতে সমগ্র মানবজাতিকে তোমাদের নিজের সন্তানের মতো মনে হয় এবং তাদের সেবা করার উদ্দীপনা তোমাদের অন্তরে এমনভাবে উথলে ওঠে, যেমন একজন মায়ের হৃদয়ে নিজের সন্তানের প্রতি ভালোবাসা সর্বদা উদ্বেলিত হয়।" - (তাফসীরে কবীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৬৯, যুক্তরাজ্য সংস্করণ)

আহমদীয়া সংবাদ

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের প্রিয় নেতা হযরত খলিফাতুল মসীহ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থ ও কুশল আছেন।

সকল আহমদী ভাই-বোন যেন হুজুরে আনওয়ার (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর সুস্বাস্থ্য, কর্মময় দীর্ঘায়ু, মহান লক্ষ্যসমূহে সফলতা এবং বিশেষ নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত দোয়া করতে থাকেন।

আল্লাহ তা'আলা যেন প্রতিটি মুহূর্তে হুজুরের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী হন এবং তাঁকে সর্বদা নিজের সমর্থন ও বিজয় দান করেন। আমীন।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সম্পাদকীয়

মজলিসে ইরফান: একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জামাআতে আহমদিয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জামাআতের সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে 'মজলিসে ইরফান' একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে আসছে। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেই এই মজলিসের সূচনা হয়। সে সময় হুযুরের বরকতময় বক্তব্যসমূহ সঙ্গো সঙ্গোই লিপিবদ্ধ করা হতো এবং পরে সেগুলো আল-হাকাম ও আল-বদর পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। পরবর্তীকালে এই মজলিসে ইরফানের বক্তব্যসমূহ 'মালফুযাত' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ প্রথম (রা.), হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.), হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ তৃতীয় (রা.) এবং হযরত আকদাস খলীফাতুল মসীহ চতুর্থ (রহ.)-এর বরকতময় যুগের মজলিসে ইরফানের কার্যক্রমও জামাআতের পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সেগুলি সহজলভ্য।

হযরত আকদাস আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস(আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয)-এর বরকতময় যুগে এই মজলিসে ইরফান প্রতি সপ্তাহে এম.টি.এ.-তে "This Week With Huzur Anwar" শিরোনামে সম্প্রচারিত হয় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও পাওয়া যায়।

প্রত্যেক যুগেই 'মজলিসে ইরফান' এমন একটি অনুষ্ঠান, যার মাধ্যমে জামাআতের সদস্যরা নৈতিক, তাবলীগ, শিক্ষা এবং সাংগঠনিক বিষয়াবলীতে বহুমুখী দিকনির্দেশনা লাভ করেছেন। অনেক সময় বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও শিক্ষাবিদ ব্যক্তিত্বও হুযুরের সঙ্গো সাক্ষাৎ করেন। তখন হুযুর তাঁদের দেশ, তাঁদের জ্ঞানক্ষেত্র এবং বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অশান্তি দূর করার উপায় সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সর্বোপরি, এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান, যা প্রত্যেক শ্রোতার জন্যই একটি উপকারী দিকনির্দেশনা।

বদর পত্রিকার পাঠকদের এই অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নমুনাস্বরূপ ২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আমেরিকার ভার্জিনিয়ার খুদ্দামদের সঙ্গো হুযুর আনওয়ারের অনুষ্ঠিত সাক্ষাতের সংক্ষিপ্তসার নিচে উপস্থাপন করা হলো।

প্রশ্ন:পার্থিব শিক্ষার পাশাপাশি জামাআতের বইপত্র কীভাবে অধ্যয়ন করা যায়?

হুযুর আকদাস বলেন: "দিনে ২৪ ঘণ্টা রয়েছে। যদি একজন মানুষ ৬ ঘণ্টা ঘুমায়, ২ ঘণ্টা খাওয়া-দাওয়ায় এবং ২ ঘণ্টা নামাজে ব্যয় করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ ঘণ্টা পড়াশোনা করে এবং বাড়ি ফিরে আরও ২-৩ ঘণ্টা অধ্যয়ন করে, তাহলে অবশিষ্ট ৪ ঘণ্টার মধ্যে কি আধা ঘণ্টাও বের করা যায় না? যদি তোমরা চাও, তাহলে অবশ্যই সময় বের করতে পারবে। যদি বলো, 'আমি খুব ক্লান্ত', তাহলে বুঝতে হবে, দুনিয়াই তোমার প্রথম অগ্রাধিকার হয়ে গেছে। তাই নিজের জীবনকে সুশৃঙ্খল করো। যদি অন্তত আধা ঘণ্টাও অধ্যয়নের জন্য বের করতে পারো, তবেই ভালো। আর যখন আগ্রহ বাড়বে, তখন আরও বেশি সময় দিতে পারবে।"

প্রশ্ন:আমি মাওলানা আতা উল্লাহ কলীম সাহেবের নাতি। তাঁর সম্পর্কে হুযুরের কোনো স্মৃতি থাকলে দয়া করে বলবেন।

হুযুর বলেন:"আমি তাঁর সঙ্গো সরাসরি কাজ করিনি। তবে আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি, তাতে তিনি ছিলেন একজন নিঃস্বার্থ ওয়াকফে-জিন্দেগী। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন এবং জামাআতের জন্য দোয়া করতেন। তোমরাও দোয়া করো, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকেও নেক বানান।

আরেকটি বিষয় হলো, তিনি যখন ঘানায় সেবা করেছেন, তখন সেখানকার পরিস্থিতি খুব ভালো ছিল না। কিন্তু তিনি কখনো অভিযোগ করেননি। সব সময় হাসিমুখে কথা বলতেন। এ কারণেই আজ তোমরা এই অবস্থানে পৌঁছেছ। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা, নিয়মিত নামাজ এবং দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

প্রশ্ন:খাকসার আঞ্চলিক নাযিম ওয়াকারে আমল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। কিছু খুদ্দাম পরিশ্রমের কাজ বা এমন কাজ, যাতে হাত ময়লা হয়, করতে চায় না। তাদের মধ্যে ওয়াকারে আমলের চেতনা কীভাবে সৃষ্টি করা যায়?

হুযুর বলেন:"ওয়াকারে আমলের ইংরেজি নাম কী রাখা হয়েছে? এর নাম রাখা হয়েছে Dignity of Labour। তাদের বোঝাও যে, এ কাজের মধ্যেই তাদের মর্যাদা নিহিত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে প্রমাণিত আছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি নিজ হাতে মাটি খনন করছিলেন; এমনকি তাঁর পেটেও মাটি লেগে গিয়েছিল।

তাই এমন খুদ্দামদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরো এবং বলো যে, এতে সওয়াবও রয়েছে, আবার স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।"

প্রশ্ন:আমি ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হতে চাই। হুযুর কী দিকনির্দেশনা দেবেন, যাতে শিক্ষা ও পেশাগত সাফল্যের পাশাপাশি ধর্ম ও আল্লাহ তাআলার সঙ্গো দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি?

হুযুর বলেন: "অনেক আহমদি ডাক্তার আছেন, যারা নিয়মিত নামাজ পড়েন এবং তাহাজ্জুদ আদায় করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে ডাক্তার আব্দুস সাত্তার শাহ সাহেব একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং হাসপাতালে কাজ করতেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ চতুর্থ (রহ.)-এর নানা ছিলেন। তিনি যেমন চিকিৎসা করতেন, তেমনি তাবলীগও করতেন।

তাঁর একটি ঘটনা আছে। একদিন তিনি মসজিদে তাবলীগ করছিলেন। তখন একজন বিরোধী ব্যক্তি মাটির তৈরি একটি লোটা তুলে তাঁর দিকে ছুড়ে মারে। এতে তাঁর মাথা ফেটে যায়। তিনি হাসপাতালে গিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে আসেন।

যে ব্যক্তি আঘাত করেছিল, সে খুব ভয় পেয়ে ক্ষমা চাইতে থাকে। তখন তিনি বলেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন আমার তাবলীগের কথা শোনো।'

লোকটি এতে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। সে ভাবল, 'আমি তো তাঁকে আঘাত করেছি, অথচ তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করছেন। নিশ্চয়ই আহমদিয়াত সত্য।' এরপর সে বাইআত করে।

তুমিও ডাক্তার হওয়ার পর তোমার রোগীদের সঙ্গো উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আচরণ প্রদর্শন করবে।"

হযরত আমীরুল মুমিনীন (আ.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবি হযরত খলিফা রশীদুদ্দীন সাহেব-এর সঙ্গো সম্পর্কিত। তিনি বলেন, ব্রিটিশ আমলে তিনি একজন সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনি এত বেশি আর্থিক কোরবানি করতেন যে, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে বলেছিলেন, "কিছুটা সংযম করুন, নিজের জন্যও কিছু রেখে দিন।" এমনকি আরও বলেছিলেন, "আপনি এত বেশি আর্থিক কোরবানি করেছেন যে, এখন যদি আর না-ও দেন, তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না।"

একইভাবে হুজুর (আ.) হযরত খলিফাতুল মসীহ প্রথম (রা.)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তিনিও একজন হাকিম (চিকিৎসক) ছিলেন। চিকিৎসা থেকে যা উপার্জন করতেন, তা ইসলামের খাতিরে ব্যয় করতেন। তিনি দরিদ্রদের সেবা করতেন এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। হুজুর (আ.) বলেন, "তোমরাও যদি দরিদ্রদের সেবা করো, তবে আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন এবং জামাআতেরও সেবা হবে।"

এরপর একটি প্রশ্ন করা হয়: প্রিয় হুজুর! পৃথিবীতে রাজনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে কীভাবে সোচ্চার হওয়া উচিত?

হুজুর (আ.) উত্তর দিলেন: "আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে, ততটুকুই আমরা করছি। আমার যতটুকু সাধ্য, আমি করছি; আর আপনাদের যতটুকু সাধ্য, আপনারাও তা করে যান।"

তিনি আরও বলেন, "আমার আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আমি তাদের শান্তির শিক্ষা দিয়েছিলাম। পরে একজন সিনেটর আমাকে বললেন, 'আপনি যে কথাগুলো বলছেন, সেগুলো খুবই ভালো এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আমরা সেগুলোর ওপর বাস্তবে আমল করতে পারি না।'"

হুজুর (আ.) বলেন, "তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে, আর সেই উদ্দেশ্য পূরণে তারা অর্থ ব্যয় করেও নিজেদের পক্ষে কথা বলায়। যখন নিজের জন্য এক ধরনের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড আর অন্যদের জন্য আরেক ধরনের মানদণ্ড রাখা হয়, তখন প্রকৃত ন্যায়বিচার কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তাই যতটুকু সম্ভব, তোমরা নিজেদের চারপাশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাও।"

প্রশ্ন করা হয়: কিছু শিয়া ভ্রাতৃবৃন্দ আহলে বাইত ও আলে রাসূলকে খিলাফতের ওপর অগ্রাধিকার দেন। এ বিষয়ে হুজুরের কী মত?

হুজুর (আ.) বলেন: "তারা তো নবুয়তের ওপরও অগ্রাধিকার দেয়। এমনকি তারা বলে, হযরত জিবরাইল (আ.) ভুল করেছিলেন; ওহি হযরত আলী (রা.)-এর ওপর নাযিল হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভুল করে তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে।"

→ শেষাংশ ১৫ পাতায়....

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family Bithari, 24 PGS (N)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, (Kolkata)

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার আদর্শ

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৬ জুন, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (২৬ এহসান, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনেও আমরা দরিদ্রদের প্রতিপালন এবং দানশীলতা ও বদান্যতার অনেক ঘটনা দেখতে পাই। আর কেবল তাঁর দাবির পর থেকেই নয়, বরং তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক যুগে এবং যৌবনকালেও আমরা তাঁর উন্নত নৈতিকতার ঘটনাবলি দেখতে পাই।

অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) যে মায়ের কোলে লালনপালন করেছেন, আমরা যখন তাঁর (মায়ের) জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন তাঁর মাঝেও দরিদ্রদের প্রতিপালন এবং দানশীলতা ও বদান্যতার বিভিন্ন ঘটনা দেখতে পাই। যেন তিনি এমন এক মায়ের কোলে লালিতপালিত হয়েছেন যিনি তাঁকে উত্তম চরিত্রও শিক্ষা দিয়েছেন, আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং যেখানে তাঁর প্রকৃতিতে পুণ্য সৃষ্টি করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর মায়ের পক্ষ থেকেও পুণ্যময় পরিবেশ লাভ করেছিলেন।

বস্তুত, তাঁর মায়ের এই দানশীলতা ও বদান্যতার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন,

হযরত মাঈ চেরাগ বিবি সাহেবা, অর্থাৎ হযরত আকদাস (আ.)-এর শ্রদ্ধেয়া মায়ের পরিবার, হুশিয়ারপুর জেলার আয়মা গ্রামের একটি সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত মোগল পরিবার ছিল। তাঁর প্রকৃতিতে দানশীলতা এবং আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। একজন সতীসাধ্বী ও মহীয়সী নারীর মাঝে যেসব উন্নতমানের গুণাবলি থাকা উচিত, তা তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। তিনি সর্বদা প্রফুল্ল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ অবস্থায় থাকতেন। আতিথেয়তার জন্য তাঁর হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল আবেগ এবং বড়ো মন ছিল। যেসব মানুষ তাঁর দানশীলতা এবং আতিথেয়তা দেখেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন। যখন হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) এটি লিখেছেন তিনি বর্ণনা করেন, তারা এখনো বেঁচে আছেন। তিনি (রা.) বর্ণনা করছেন, তাঁকে যদি বাইরে থেকে এই সংবাদ দেওয়া হতো যে, চারজন মানুষের জন্য খাবার প্রয়োজন, চারজন অতিথি এসেছেন, তখন ভেতর থেকে খাবার পাঠানোর সময় তা আটজনেরও বেশি মানুষের জন্য পাঠানো হতো, যেন আরও কেউ এসে পড়লে বা সাথে বসে থাকলে তারাও খেতে পারেন; আর অতিথিদের আগমনে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। এরপর তিনি লেখেন, তিনি নিজের শহরের দরিদ্র ও দুর্বলদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন এবং তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের একটি বিশেষ দিক ছিল, দরিদ্র মৃত ব্যক্তিদের কাফনের কাপড় তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যেত। যদি কোনো গরিব মানুষ মারা যেত, তাহলে তিনি তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতেন। মোটকথা, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কারণে তিনি সবার কাছে একপ্রকার স্নেহময়ী মায়ের মতো ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তরবিয়ত বা লালনপালনে তাঁর শ্রদ্ধেয়া মায়ের এই গুণাবলি এবং নৈতিকতা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং যেহেতু তিনি (আ.) একটি বিশাল পরিবারের অধিকারী হতে যাচ্ছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা শুরু থেকেই এসব উন্নতমানের গুণাবলি সৃষ্টির জন্য তাঁর নিমিত্তে এই ব্যবস্থা করেছিলেন যে, তাঁকে এমন এক স্নেহময়ী মাতার কোলে রেখেছিলেন যিনি সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি, আতিথেয়তা এবং দানশীলতা ও বদান্যতায় ছিলেন অতুলনীয়। এভাবে যেন তিনি (আ.) এসব গুণাবলি মায়ের দুধের সাথে পান করেছিলেন। অমুখাপেক্ষিতা, বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং স্পষ্টবাদিতার গুণাবলি তিনি তাঁর পিতা মহোদয়ের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন, আর আতিথেয়তা, দানশীলতা, বদান্যতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি তিনি তাঁর মাতা মহোদয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলেন।" [হায়াতে আহমদ, প্রণেতা- ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১৭-২১৮]

যৌবনকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার যেসব ব্যক্তিগত ঘটনা পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে হযরত মিয়াঁ আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যে সময় হুযূর (আ.) সিয়ালকোটে চাকরি করতেন, তখন একবার হুযূরের জন্য হুযূরের মাতা দুটি পোশাক অর্থাৎ দু'জোড়া কাপড় এবং কিছু পিন্নি (বা মিষ্টান্ন) মঙ্গাল নামক এক নাপিতের মাধ্যমে পাঠান। মঙ্গাল নাপিতের মাধ্যমে পাঠান। ফেরত আসার সময় মঙ্গাল আমাদের গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিল; মিয়াঁ আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, তখন সে আমাদের গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিল। সে আমাদেরকে বলেছে, আমি যখন এসব জিনিস নিয়ে সিয়ালকোটে যাই এবং হুযূরের সামনে রাখি, তখন হুযূর (আ.) বলেন, তোমার ভাগে যা পড়ে তা তুমি নিয়ে নাও, আর আমার ভাগ আমাকে দাও। আমি বলি, হুযূর! এগুলো আপনার জন্য। আম্মাজান অর্থাৎ আপনার মা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, তুমি এতদূর থেকে কষ্ট করে এগুলো বয়ে এনেছ, তুমি অবশ্যই তোমার অর্ধেক ভাগ নিয়ে নাও। যাহোক, আমাকে একটি পোশাক অর্থাৎ এক জোড়া কাপড় এবং কিছু পিন্নি দিয়ে দেন এবং বলেন, আম্মাজানকে গিয়ে বলবে, তিনি যেন আমাকে এখান থেকে দ্রুত ফেরত নিয়ে যান। আমার এখানে মন টিকছে না। লোকেরা অন্যায় কাজে জীবন অতিবাহিত করে এবং তাদের দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হয়।"

[আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩০]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের বরাতে বর্ণনা করেন, আমি যখন সিয়ালকোটে ছিলাম, সেখানে আমার ফযল দ্বীন সাহেবের কন্যা মাঈ হায়াত বিবি সাহেবার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়, যিনি হযরত কারী হাফেয মুহাম্মদ শফী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মাতা। মাঈ সাহেবা বলেন, প্রথমে মির্যা সাহেব এই মহল্লারই একটি চিলেকোঠায় থাকতেন, যা ঝান্ডাওয়ালা মহল্লায় অবস্থিত আমাদের বর্তমান বাড়ির সাথে সংলগ্ন। যখন সেই ঘরটি ভেঙে পড়ে, তখন মির্যা সাহেব কাশ্মীরী মহল্লায় অবস্থিত আমার পিতার বাড়িতে চলে আসেন। তিনি বলেন, যখন তিনি আমাদের বাড়িতে আসেন তখন আমি লক্ষ করি, তিনি বাড়িতে কারো সাথে মেলামেশা করতেন না। এছাড়া তিনি একথাও বলেন, মির্যা সাহেব যে বেতন পেতেন তা মহল্লার বিধবা ও অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন, তাদের কাপড় বানিয়ে দিতেন বা নগদ অর্থ দিয়ে দিতেন এবং নিজের জন্য কেবল খাবারের খরচটুকু রেখে দিতেন।

[সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯-৫৯৫]

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, দানশীলতা ও বদান্যতা সম্পর্কে আমরা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং আমাদের সামনে সংঘটিত এসব ঘটনা ও অবস্থার প্রতি লক্ষ করি তখন বুঝতে পারি, তাঁকে এই মহান চরিত্রের এক বিশাল অঙ্ক প্রদান করা হয়েছিল এবং এই আচরণ তাঁর জীবনচরিতে সেই সময় থেকেই পাওয়া যায় যখন থেকে তিনি বুঝতে শিখেছিলেন। "

একেবারে শৈশব এবং যৌবনকাল থেকেই। এমনটি নয় যে, প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পর কোনো কৃত্রিমতার কারণে তাঁর দ্বারা এ ধরনের নৈতিক গুণাবলির প্রকাশ ঘটত, বরং এটি তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতির একটি অঙ্গ ছিল। এ ধরনের নৈতিকতা কখনও কখনও সম্পূর্ণ গোপন থাকত এবং মাঝে মাঝে ঘটনাচক্রে এমনভাবেও এর প্রকাশ ঘটত যেন অন্যরা জানতে পারে। তাঁর সহজাত প্রবণতা ছিল, এটি যেন গোপন থাকে; তিনি কোনো পুণ্য করলে তা যেন গোপন থাকে। তাই তাঁর জীবনের প্রারম্ভিক সময়ের দানশীলতা ও বদান্যতার ঘটনাগুলো সাধারণত গোপনই থাকত। কারণ তিনি একজন নির্জনতাপ্রিয় মানুষ ছিলেন এবং সেই সময়ের অবস্থানুসারে তিনি গোপনে কিছু মানুষের সাথে সদাচরণ করতেন বা তাদেরকে সাহায্য করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে জনসমক্ষে আনেন, প্রত্যাদিষ্ট করেন এবং ব্যাপকহারে মানুষের যাতায়াত আরম্ভ হয় আর তাঁর অবস্থা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে, তখন এসব ঘটনা প্রত্যক্ষকারী এবং বর্ণনাকারীদেরও জন্ম হয়।"

তিনি (রা.) লেখেন, হুযূর (আ.) কোনো অভাবী বা যাচককে কখনও খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। তাঁর জীবন أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (সূরা আদ-দুহাঃ ১১) 'আর সাহায্যপ্রার্থীর বিষয়ে নির্দেশনা হলো, তুমি তাকে ভর্ৎসনা কোরো না'- এর এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিল।

হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব বলেন, একদিন এমন হলো যে, আসরের নামাযের পর তিনি (আ.) নিয়মানুযায়ী ওঠেন এবং মসজিদের খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে যাওয়ার জন্য পা রাখেন। এমন সময় একজন সাহায্যপ্রার্থী আস্তে করে বলে, আমি অভাবগ্রস্ত। হুযূরের (আ.) তখন একটি জরুরি কাজও

ছিল এবং সেই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর অন্য মানুষের আওয়াজের সাথে কিছুটা মিশে গিয়েছিল, অর্থাৎ যারা নামাযের পর উঠেছিল এবং স্বভাবতই নিজেদের মধ্যে কোনো না কোনো কথা বলছিল। বস্তুত, হুযূর (আ.) অবচেতনভাবেই ভেতরে চলে যান; অর্থাৎ নিজের অজান্তেই মনোযোগ না দিয়ে ভেতরে চলে যান। আওয়াজ যদি হালকাভাবে কানে গিয়েও থাকে, যেহেতু তাঁর মস্তিস্কে অন্য কোনো কাজের ব্যস্ততা ছিল, তাই মনোযোগ দেন নি এবং চলে যান আর ভ্রূক্ষেপ করেন নি। কিন্তু যখন তিনি নীচে যান, তখন কানে আসা সেই ধীর কণ্ঠস্বর তাঁর হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ ভেতরে গিয়ে তাঁর আবার অনুভূতি হয় যে, আমি এমন একটি আওয়াজ শুনেছিলাম; কেউ বলেছিল- 'আমি অভাবগ্রস্ত'। তাঁর হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি দ্রুত ফিরে আসেন এবং খলীফা নূরুদ্দীন সাহেবকে ডেকে বলেন, একজন সাহায্যপ্রার্থী ছিল, তাকে খোঁজো। সাহায্যপ্রার্থী ছিল, কোথায় গেল? সেই সাহায্যপ্রার্থী তিনি (আ.) চলে যাওয়ার পর চলে গিয়েছিল। খলীফা সাহেব অনেক খোঁজাখুঁজি করেন, কিন্তু কোনো সন্ধান পান নি। এই খলীফা নূরুদ্দীন সাহেব কাশ্মীরের এক ভদ্রলোক ছিলেন। যাইহোক, তিনি বলেন, সন্ধ্যায় যথারীতি নামায পড়ে বসলে সেই সাহায্যপ্রার্থী আবার আসে এবং কিছু চায়। হুযূর (আ.) খুব দ্রুত পকেট থেকে কিছু বের করেন এবং তার হাতে রেখে দেন; আর তখন মনে হয় তিনি এতটা আনন্দিত হয়েছেন, যেন তাঁর ওপর থেকে কোনো বোঝা নেমে গেছে।

কয়েক দিন পর তিনি (আ.) বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, সেদিন যখন যে ওই সাহায্যপ্রার্থীকে পাওয়া যায় নি, তখন আমার হৃদয়ে এমন এক বোঝা ছিল যা আমাকে ভীষণ অস্থির করে রেখেছিল আর আমি ভয় পাচ্ছিলাম, আমার দ্বারা কোনো পাপ হয়ে গেছে, কারণ আমি সাহায্যপ্রার্থীর দিকে মনোযোগ দিই নি এবং এভাবে দ্রুত ভেতরে চলে গিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লার কাছে শুকরিয়া যে, সে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিল; অন্যথায় খোদা জানেন, আমি কত না অস্থিরতায় থাকতাম! আর আমি দোয়ায়ও করেছিলাম যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে ফিরিয়ে আনেন। " [সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি, ২য় ভাগ, পৃ: ২৮৫-২৮৬]

একইভাবে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব নিজ সীরাত গ্রন্থে এক স্থানে লেখেন, কাদিয়ানের কাছাকাছি সাঠিয়ালী নামের একটি ছোটো গ্রাম রয়েছে, যা কাদিয়ান থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান থেকে এক জাঠ ফকির আসত; তাকে দেখেছে- এমন বহু লোক এখনও বর্তমান আছে। সে মসজিদে মোবারকের ছাদের নীচে এসে সেই জানালার কাছে আওয়াজ দিত, যা বায়তুল ফিকরের পশ্চিম দেয়ালে অবস্থিত। সে ডাক দিয়ে বলত, গোলাম আহমদ! এক রুপি নেব; আর সে সেখানে বসে পড়ত। হযরত সাহেব (আ.) মাঝে মাঝে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং তাঁর মনোযোগ সেই কাজের প্রতি নিবদ্ধ থাকত। তিনি তার ডাক শুনতে পেতেন না, ফলে সে কিছুক্ষণ পরপর ডাক দিত। বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটি অপছন্দনীয় মনে হতো যে, সে এখানে বসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কেন বিরক্ত করছে! আর কেউ তাকে বারণ করলে সে বলত, আমি কি তোমাদের কাছে এসেছি? আমি তো গোলাম আহমদ (আ.)-এর কাছে চাইছি। হযরত আকদাসের কাছে যদি এ খবর পৌঁছত যে, কেউ তাকে কিছু বলেছে, তবে তিনি তা অপছন্দ করতেন এবং হাসতে হাসতে তাকে রুপি দিয়ে দিতেন। আর তাঁর এই নিয়মও ছিল যে, তিনি কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় রাখতেন না।" [সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি, ২য় ভাগ, প ৃ: ২৯২]

হযরত চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব বর্ণনা করেন, একবার প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে এসে হুযূর (আ.) যখন বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন, তখন লেংটি পরিহিত এক দরবেশ ডাক দেয়। সে ফকির ছিল। কেউ কেউ এমন পোশাক পরে যেন তাদের কাছে কোনো পোশাক নেই; এটাই তাদের মতে আধ্যাত্মিক সাধনা হয়ে থাকে। যাইহোক, তিনি বলেন, সে ডাক দিয়ে বলে, দাতা, দাতা! কিছু দাও। হুযূর (আ.) বলেন, আল্লাহ্ই দাতা; একথা বলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ সে (হুযূরকে) দাতা বলেছিল; হুযূর (আ.) বলেন, আল্লাহ্ই দাতা। সে আবার ডাক দেয়, দাতা তো আল্লাহ্ই, আপনি কিছু দিয়ে দিন। হুযূর (আ.) তার জন্য কিছু পাঠিয়ে দেন। যাইহোক, তাঁর এই কথায় তার কী-ই বা তরবিয়ত হতো, কিন্তু এই কথার মাধ্যমে তিনি (আ.) নিজ অনুসারীদের এই শিক্ষা প্রদান করেন যে, আমাদের কথাবার্তায় শিরকের লেশমাত্রও থাকা উচিত নয়। [আসহাবে আহমদ, খণ্ড-৫, পৃ: ২৯৮]

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, একদা একজন ভিক্ষুক আসে। সে কাদিয়ানে ঘুরে বেড়াতে থাকে। সে সকালে উঠত এবং মরহুম হযরত মীর হামিদ শাহ সাহেবের কবিতা পড়ত। ঘুরে বেড়ানোর অর্থ হলো, সে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এই কবিতার চরণগুলো আবৃত্তি করত:

খোদা তোমার সাহায্যকারী হয়েছেন, হে আমার কাদিয়ানবাসী!
তুমি আমাদের নিরাপত্তা দান করেছ, হে দারুল আমানবাসী!

যাইহোক, সে এটি পড়ত এবং মাঝে মাঝে এর সাথে এটিও পড়ত:

সকল দিকে চিন্তা প্রসারিত করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হলাম আমরা

সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবিতা পড়ত। সে সমগ্র কাদিয়ান চক্কর দিত। যখন সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় কবিতাটি পড়ত, তখন হযরত মাখদুমুল মিল্লাত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-র কাছে তা অত্যন্ত অসহনীয় লাগত। তিনি বলতেন, সে এই কবিতার যোগ্য নয়। কারণ, এই কবিতাটি এক বাস্তব সত্য এবং (আধ্যাত্মিক) অবস্থা; এর মধ্যে ব্যাপক গভীরতা রয়েছে; যা কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তাতেই পাওয়া যায়। এই কবিতায় যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে, তা তো সাধারণ মানুষের মধ্যে হতেই পারে না। এই কবিতায় যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি বলতেন, (মসীহ্ মওউদের জন্য) আত্মাভিমানের কারণে আমি এটি অন্য কারো মুখ থেকেই শুনতে পারি না, সেখানে এই ধরনের সাধারণ একজন ভিক্ষুক তা পড়ে বেড়াবে! একজন সাধারণ মানুষ বা ফকির এই ধরনের কবিতা পড়বে- এতে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের খুব রাগ হতো। যাইহোক, তিনি বলেন, এটি তো মাখদুমুল মিল্লাতের সেই ভালোবাসা ও প্রেমের অবস্থা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর ছিল। একবার সেই ভিক্ষুক কাদিয়ানে চক্কর দেয়। তখন রমযান মাস ছিল। এই সময়ের মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে একাধিকবার অনেক কিছু দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বলত, আমার থালা ভরে দিন! ঈদের দিন সে অনেক বড়ো একটি থালা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং মসজিদে দরজার কাছে চাদর বিছিয়ে বসে পড়ে। আর যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমন করেন তখন সে আবেদন করে, আমার থালা ভরে দিন। হযরত আকদাস (আ.) তাতে একটি টাকা রাখেন। তাঁর এই টাকা রাখার সাথে সাথেই যেন টাকার বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের মুদ্রায় তার থালা ভরে দেওয়া হয়। যখন হযরত সাহেব (আ.) তার আবেদন শোনেন তখন তিনি মৃদু হাসেন এবং এই অবস্থায় টাকাটি দেন।"

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা-হযরত শেখ ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি, ২য় ভাগ, পৃ: ২৯২-২৯৩]

যাইহোক, তাঁর দেওয়ার পর তাঁর মান্যকারীরাও কিছু না কিছু মুদ্রা দিয়ে তাকে সাহায্য করেন এবং এভাবে তার থালা ভরে যায়।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, হুযূর (আ.) যখন ১৯০৫ সালে শেষবারের মতো দিল্লী গিয়েছিলেন, তখন একদিন তিনি দিল্লীর মাযার ইত্যাদি দর্শনের উদ্দেশ্যে বের হন। কেউ একজন নিবেদন করে, হুযূর! এদিকে রাস্তায় এত বেশি ভিক্ষুক থাকে যে, পথ চলা কঠিন হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, আজ আমরা যাব, আমরা সবাইকে দেবো; যতজন ভিক্ষুক বসে আছে, আমরা সবাইকে দেবো। এটি কোনো সাধারণ সংকল্প ও সাহসের বিষয় ছিল না; তিনি (আ.) বাস্তবে এই বিষয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন যে, যে-ই চাইবে তাকেই তিনি দেবেন। যে বিপুল সংখ্যায় ভিক্ষুক থাকার কথা বলা হয়েছিল ততটা অবশ্য পাওয়া যায় নি, তবে কয়েকজন পাওয়া গিয়েছিল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ আবেদনের ফল বাস্তব রূপে লাভ করেছিল। অর্থাৎ যতজনকেই পাওয়া গিয়েছিল, তিনি (আ.) প্রত্যেককে সাহায্য করেছিলেন।

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা-হযরত শেখ ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি, ২য় ভাগ, পৃ: ৩০৮]

হযরত হাফেয আহমদুল্লাহ্ নাগপুরী সাহেব (রা.) বলেন, একদিন হুযূর (আ.) গোল কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন। প্রায় কুড়ি বা পঁচিশজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (আ.) কোনো বিষয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন ফকির আসে এবং উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা চায়। তিনি বলেন, এটি আমার কাছে খুব বিরক্তিকর মনে হয় যে, সে হুযূর (আ.)-এর কথা বলার মাঝে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে; তিনি (আ.) কথা বলছেন আর সে হস্তক্ষেপ করছে! আমি দরজা বন্ধ করে দিই। আমি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলাম। হুযূরের (আ.) দৃষ্টি সেদিকে পড়ে। তিনি (আ.) তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করে আমাকে বলেন, যাও, উঠে ভিতরের দরজায় কড়া নেড়ে এই ভিক্ষুককে ভেতর থেকে কিছু দেওয়ানোর ব্যবস্থা করো। অর্থাৎ তিনি বলেন, দরজা কেন বন্ধ করেছ? এখন তুমি যাও, ঘরের ভেতর আওয়াজ দাও এবং সেখান থেকে কিছু নিয়ে এই ভিক্ষুককে দাও। আর ঘর থেকে আনিয়ে তারপর তিনি (আ.) তাকে সাহায্য করেন। আর তিনি বলেন,

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

সময় সংকীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। (আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

ভিক্ষুকের আবেদন শুনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া মোটেই ভালো নয়। ভিক্ষুকের যাচনা শুনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কাজ।

[সীরাত আহমদ, প্রণেতা- কুদরাতুল্লাহ্ সানোরি সাহেব, পৃ: ৪৮৭]

হযরত বাবু গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একজন সারেঙ্গীবাদক গায়ক হুযুর (আ.)-এর কাছে ভিক্ষুক হিসেবে তাঁর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হয়। হুযুর (আ.) তাকে একটি সিকি (চার আনা) দেন। এমন সময় মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) সেখানে চলে আসেন। হযরত সাহেব (আ.) এর মধ্যেই ভেতরে চলে গিয়েছিলেন। মীর সাহেব তাকে দেখে সারেঙ্গী বাজানোর কারণে খুব বকাবকি করেন এবং বলেন, খবরদার! আর কখনও যদি এখানে এসেছ! পরের দিন সে আবারও চলে আসে। হযরত সাহেব (আ.) তাকে দেওয়ার জন্য বাইরে এসে দেখেন, ভিক্ষুক সেখানে নেই। সে হয়ত মীর সাহেবকে দেখতে পেয়েছিল। তার মীর সাহেবের গতদিনের বকুনির কথা মনে ছিল, তাই সে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখন তিনি (আ.) একজনকে বলেন, যাও, সেই সারেঙ্গীবাদক ভিক্ষুককে খুঁজে দেখো, সে কোথায় গেছে। কেউ একজন বলে, হুযুর, সে তো পালিয়ে গেছে। তিনি (আ.) বলেন, যাও, তুমিও দৌড়ে গিয়ে তাকে ডেকে আনো। যাইহোক, সে আসে এবং মীর সাহেবকে দেখে ভয় পায়। তখন হযরত সাহেব (আ.) মীর সাহেবকে বলেন, মীর সাহেব, এই বেচারা কী করবে, তার তো আর কোনো পেশা জানা নেই। সে কোনো কাজই জানে না, সে কী করবে? সারেঙ্গী বাজায়, বাদ্যযন্ত্র বাজাতে থাকে। আপনি তাকে কোনো পেশা শিখিয়ে দিন, কোনো কাজ তাকে শিখিয়ে দিন, তাহলে সে আর এটি বাজাবে না। তার জন্য কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিন।

তারপর সেই গায়ককে একান্তে ডেকে তিনি (আ.) বলেন, যতদিন তুমি এখানে থাকবে, সারেঙ্গী বাজাবে না। মীর সাহেব মারধর করতে পারেন। তিনি দ্রুত উত্তেজিত হয়ে পড়েন, পাছে তোমাকে মেরেই বসেন! তোমাকে হয়ত দু-এক চড় মেরেই বসবেন। যাইহোক, তুমি এখানে বাদ্যযন্ত্র বাজাবে না। চুপিসারে দরজার শিকল বা কড়া নেড়ো, আমি তোমাকে কিছু না কিছু দিয়ে দেবো। ফলে যতদিন সে কাদিয়ানে ছিল, প্রতিদিন চার আনা করে নিয়ে যেত।" [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৭]

হযরত সৈয়দ ফযল শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একজন ফকিরের অভ্যাস ছিল, হযরত সাহেব (আ.)-এর কাছে এসে সে কখনও বলত এক আনা দিন, কখনও বলত দুই আনা, কখনও বা আট আনা; মোটকথা সে নির্দিষ্ট করে কিছু না কিছু চাইতই। হযরত সাহেব (আ.) যদি কোনো কাজে বা কথায় ব্যস্তও থাকতেন, সে বার বার বলতে থাকত এবং নিয়েই ছাড়ত; সে কখনোই পিছু ছাড়ত না। পরবর্তীতে হযরত সাহেব (আ.) তার স্বভাব সম্পর্কে বেশ ভালোভাবে অবগত হয়ে গিয়েছিলেন। যখন সে আসত এবং যত টাকা চাইত, তিনি (আ.) তাকে ঠিক ততটাই দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, সে তো এতটুকু না নিয়ে নড়বেই না। সে যতটুকু চায়, তাকে ততটুকুই দিয়ে দাও।"

[সীরাত আহমদ, প্রণেতা- কুদরাতুল্লাহ্ সানোরি সাহেব, পৃ: ১৫২]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, আমি ১৮৯৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে হুযুর (আ.)-এর সমীপে চলে আসি এবং ১৮৯২ সাল থেকে কাদিয়ানে যাতায়াত করতাম। আমার সামনে অনেকেই ভিক্ষা চেয়েছে, কিন্তু আমি হযরত সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কখনও দেখি নি যে, তিনি (আ.) কোনো ভিক্ষুককে তামার মুদ্রা অর্থাৎ পয়সা দিয়েছেন। তিনি (আ.) ভিক্ষুককে সর্বদা রুপার মুদ্রাই দিতেন। তৎকালীন মুদ্রার প্রচলন অনুযায়ী তামার মুদ্রা ছিল এক পয়সা, দুই পয়সা বা আধা আনা পর্যন্ত। আর রুপার মুদ্রা হতো এক আনা, দুই আনা বা তার চেয়ে বড়ো মুদ্রা। এগুলো চার আনা (সিকি) ইত্যাদির সমমূল্যের হতো। যদিও সে যুগে এক পয়সা ও দুই পয়সারও যথেষ্ট মূল্য ছিল, তবুও তিনি (আ.) এক আনা, দুই আনা বা তার চেয়েও বেশি দান করতেন, যা একটি বেশ ভালো অঙ্কের অর্থ ছিল। আর সাধারণত একজন সামান্য ভিক্ষুককেও তিনি এক টাকা দিয়ে দিতেন।

একজন অআহমদী ফকির একবার হুযুরের সমীপে এসে আবেদন করে, আমি জঙ্গলে একটি কূপ খনন করতে চাই। সেখানে মুসাফিররা এর মাধ্যমে আরাম পাবে এবং তারা পানি পান করবে। তিনি বলেন, হযরত সাহেব (আ.) তাকে এই উদ্দেশ্যে দুইশ টাকা দিয়ে দেন।

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা: হযরত শেখ ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৮]

এবং বলেন, তুমি তো মানুষের সেবার জন্যই এই কাজ করছ; যাও, কূপ খনন করো, আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি। তিনি (আ.) জামা'তকে মানবসেবার যে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছেন, তার বাস্তব দৃষ্টান্তও তিনি নিজেই স্থাপন করে দেখিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত আব্দুস সামী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের আকীকা ছিল এবং অতিথিশালায় সব অতিথি খাবার খাচ্ছিলেন। জীবিত পুত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাঁর (আ.) তৃতীয় পুত্র। পরবর্তীতে আরও সন্তান জন্মগ্রহণ করে মারাও গিয়েছেন, কিন্তু হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব, যিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন, তাঁরই আকীকা ছিল। লোকজন খাবার খাচ্ছিল, হুযূরও (আ.) সাথে শামিল ছিলেন। এমন সময় একজন ফকির অতিথিশালার ভেতরে ভিক্ষা চাইতে চলে আসে। লোকেরা তাকে বের করে দিতে উদ্যত হয়।

হুযূর (আ.) নিজে সেই ফকিরের হাতে খাবার তুলে দেন এবং ফকিরটিকে ধমকাতে লোকজনদের বারণ করেন।

[আসহাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৯]

(তিনি বলেন,) সে যদি খাবার খেতে এসে থাকে তবে তাকে ধমকাবে না। তিনি নিজে প্লেটে তুলে তাকে খাবার দিয়ে দেন।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক মৌলভী কাদিয়ানে আসে এবং হুযূর (আ.)-এর সাথে বিতর্ক শুরু করে। অতঃপর হুযূর (আ.) যখন তাকে উত্তর দেওয়া শুরু করেন, তখন সে চুপ হয়ে যায়। ঈসা (আ.)-এর জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত আলোচনা হচ্ছিল এবং এটি প্রাথমিক যুগের ঘটনা। তিনি (আ.) যখন তাকে বোঝান এবং সে চুপ করে থাকে, তখন তিনি (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি যে যুক্তিগুলো দিয়েছি তা সঠিক কি না- আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন? সে বলে, জি, আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু সে অত্যন্ত ধৃষ্টতার পরিচয় দেয়। সে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনি দাজ্জাল! (নাউযুবিল্লাহ্)। কারণ দাজ্জালের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, সে বিতর্কে অন্যদের মুখ বন্ধ করে দেবে, অর্থাৎ নিরুত্তর করে দেবে। তখন তিনি (আ.) আর কিছু বলেন নি এবং সে চলে যায়। অমৃতসরে গিয়ে সে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপায় এবং তাতে এই ঘটনাটি বর্ণনা করে যে, আমি এই কথাগুলো বলেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (আ.) যখন ভেতরে চলে যান, তখন আমি একটি চিরকুট পাঠাই যে, আমি অভাবগ্রস্ত। এখন দেখুন, এখানে সে নিজেই নিজের আত্মমর্যাদাহীনতার প্রকাশ ঘটাচ্ছে এবং হুযূর (আ.)-এর সদাচারণের প্রকাশ নিজেই করছে। সে বলে, আমি চিরকুট পাঠাই যে, আমি অভাবগ্রস্ত, আমার সাথে সদাচরণ করা উচিত। যদিও আমি আপনাকে অত্যন্ত কটু কথা বলেছি, কিন্তু যাইহোক আমি অভাবগ্রস্ত, আমার সাথে সদ্ব্যবহার করুন। তিনি (আ.) সাথে সাথে পনেরো টাকা পাঠিয়ে দেন। সে লেখে, তিনি (আ.) সাথে সাথে আমাকে পনেরো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন; তিনি অত্যন্ত দানশীল, আর তাঁর মুখের ওপর কটু কথা বলা হলেও তিনি রুষ্ট হন না। তিনি (আ.) স্বয়ং এই শেষ বিষয়টি, অর্থাৎ পনেরো টাকা পাঠানোর কথা কারো কাছে উল্লেখ করেন নি; কিন্তু তার এই বিজ্ঞপ্তি থেকে মানুষ জানতে পারে, তার কঠোর বাক্যবাণ সত্ত্বেও তিনি (আ.) তাকে পনেরো টাকা পাঠিয়েছিলেন।

[আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৬]

হযরত কাজী আব্দুল গফুর সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৬ সালে আমি আমার বড়ো ভাই হাফেয মুরাদ বখশ সাহেবের সাথে রাওয়ালপিন্ডি থেকে কাদিয়ানে যাই। হুযূর (আ.) মসজিদের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। এক ব্যক্তি, সম্ভবত রাওয়ালপিন্ডির বাসিন্দা হেকিম শাহনেওয়াজ সাহেব, হুযূর (আ.)-কে একটি থলিতে সতেরো পাউণ্ড নযরানা (উপঢৌকন) দেন। হুযূর (আ.) সেই থলেটি নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দেন। নীচে একজন ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ছিল, সে সাহায্য চায়। হুযূর সেই থলেটি পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিয়ে দেন। উল্লিখিত হেকিম সাহেব যখন হুযূরকে এমনটি করতে দেখেন তখন নিবেদন করেন, হুযূর! ওই থলেতে সতেরো পাউন্ড ছিল। তিনি (আ.) বলেন, এটি তার ছিল; তার কাছেই পৌঁছে গেছে। এরপর তিনি নীরব হয়ে যান। সেই যুগেও এক পাউন্ডের অনেক মূল্য ছিল; এক পাউন্ডে ভারতীয় পনেরো রুপি পাওয়া যেত, অর্থাৎ সে যুগে এটি বিশাল অঙ্কের অর্থ ছিল; (সতেরো পাউন্ডের) সর্বমোট ২৫৫ রুপি হয়। কেননা তখন মাত্র দুই পয়সাতেই রুটি ও খাবার পাওয়া যেত। [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯০]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, দান-সদকা করা হুযূরের নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। সাধারণত তাঁর রীতি ছিল, তিনি (আয়ের) এক দশমাংশ সদকা দিয়ে দিতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-র একটি রেওয়ায়েত হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, আমার কাছে শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অনেক বেশি সদকা দিতেন। সাধারণত তিনি এত গোপনে দান করতেন যে, আমরাও তা জানতে পারতাম না। অধম জানতে চায়, (তিনি) কী পরিমাণ সদকা দিতেন? আম্মাজান বলেন, অনেক দিতেন, কিন্তু জীবনের শেষ দিনগুলোতে (তাঁর কাছে) যত অর্থ আসত তার এক-

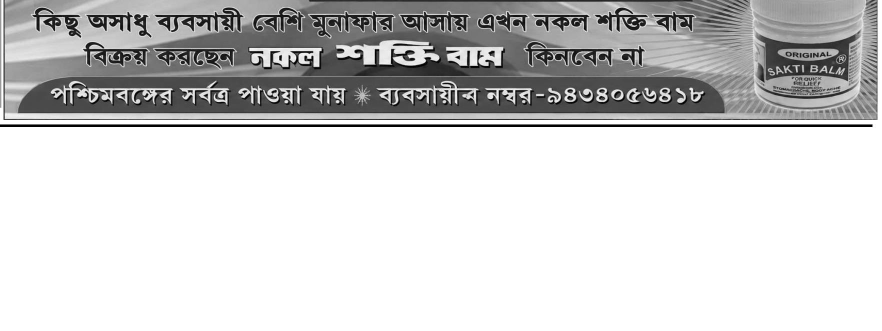

দশমাংশ তিনি সদকার জন্য পৃথক করে রাখতেন এবং সেখান থেকেই দিতে থাকতেন।

আম্মাজান আরও বলেন, এর অর্থ এমন নয় যে, (তিনি) এক-দশমাংশের চেয়ে বেশি দান করতেন না। বরং তিনি বলতেন, অনেক সময় বিভিন্ন খরচ বেড়ে যায়, (যেমন) অতিথি আসছে, লঙ্গারখানার ব্যয় রয়েছে, আরও অন্যান্য খরচ রয়েছে। তখন মানুষ সদকা দিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কিন্তু যদি শুরুতেই সদকার টাকা পৃথক করে রাখা হয়, তাহলে আর সেই আলস্য হয় না। কারণ তখন সেই টাকা অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা যায় না। আম্মাজান বলেন, এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর কাছে আসা মোট অর্থের এক-দশমাংশ আগে থেকেই পৃথক করে রাখতেন, নতুবা তিনি তো এর চেয়েও বেশি দান-সদকা দিতেন। এরপর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, আমি এটি আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করি, তিনি (আ.) কি সদকা দেওয়ার সময় আহমদী ও অআহমদীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন? আম্মাজান বলেন, না! তিনি কখনো এটি দেখতেন না যে, কে আহমদী আর কে অআহমদী। অভাবী হলেই তাকে সাহায্য করতেন।

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৯১]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, যেমনটি হুযূরের অভ্যাস ছিল, সাহায্যপ্রার্থীকে তিনি কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না আর যেভাবে না চাইতেও তিনি অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতেন, তেমনিভাবে এটিও তাঁর অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, মানুষের চাওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইঙ্গিতও তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন এবং এমন পরিস্থিতিতেও তিনি উদারভাবে দান করতেন।

সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি হুযূর (আ.)-এর জন্য একটি অত্যন্ত সুন্দর টুপি পাঠিয়েছিল। যখন সেই পার্সেলটি হুযূরের নিকট পৌঁছে, ঘটনাক্রমে সেখানে একজন হিন্দুও উপস্থিত ছিল। তিনি (আ.) পার্সেলটি খুললে তাতে একটি টুপি দেখতে পান। সেই হিন্দু ব্যক্তি টুপিটির অনেক প্রশংসা করে।

তিনি (আ.) যখন সেই হিন্দু ব্যক্তির মুখে টুপির এত প্রশংসা শোনেন, তখন সঙ্গে সঙ্গেই সেই টুপিটি তাকে দিয়ে দেন।"

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৯০]

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী (রা.) বর্ণনা করেন, হাজী হোসেন নামের একজন আহমদী ছিলেন, তিনি হজ্জ করে ফেরত আসেন এবং খাঁটি মুক্তার অর্থাৎ একটি মূল্যবান তসবীহ্ নিয়ে আসেন আর সেটি উপহারস্বরূপ হুযূর (আ.)-এর সেবায় উপস্থাপন করেন। সেটি খাঁটি মুক্তার অত্যন্ত মূল্যবান একটি তসবীহ্ ছিল। আর সে-সময় অধম (হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলবী) এবং সিয়ালকোটের আরেকজন বন্ধু হুযূরের সমীপে উপস্থিত ছিল। আমাদের সামনেই হাজী হোসেন সাহেব তসবীহ্‌টি হুযূরের সেবায় উপস্থাপন করেন। হুযূর জাযাকাল্লাহ্ বলেন। সেই তসবীহ্‌টি ছিল ভারি সুন্দর! তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মনে মনে সংকল্প করি, তার যাওয়ার পরে তসবীহ্‌টি আমি চেয়ে নেব। আবার সিয়ালকোট নিবাসী সেই বন্ধুও একই ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। হাজী হোসেন সাহেব যখন চলে যান তখন সিয়ালকোটের বন্ধুটি নিবেদন করেন, হুযূর! এই তসবীহ্‌টি খুবই সুন্দর! তিনি (আ.) বলেন, আপনার যদি পছন্দ হয় তাহলে আপনি নিয়ে নিন, একথা বলে তসবীহ্‌টি তাকে দিয়ে দেন। আমি নিবেদন করি, হুযূর! এটি নেওয়ার ইচ্ছে তো আমারও ছিল। উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক করে নাও। পরবর্তীতে সিয়ালকোটের সেই বন্ধু আমাকে বলেন, তসবীহ্ তো একশ' দানারই হয়ে থাকে, তাই এটি আমার কাছেই থাকুক। আমি বলি, ঠিক আছে, তাহলে আপনিই রেখে দিন। এরপর তিনি (রা.) তাকে দিয়ে দেন।

[আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৫]

হযরত হেকিম আল্লাহ্ দিত্তাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সরফরায খান বর্ণনা করেছেন যে, আমরা জলসায় এসেছিলাম। জনৈক ব্যক্তি হুযূরকে একটি মাদি ঘোড়া উপহার দেয়। সরফরায বলেন, আমার মন চাচ্ছিল, এই ঘোড়াটি আমি যদি পেতাম আর আমি এটিকে নিয়ে যেতাম এবং বলতাম, মসীহ্‌র ঘোড়া আমি নিয়ে এসেছি! বাহনের জন্য বেশ উন্নত জাতের একটি ঘোড়া ছিল। জলসা শেষ হওয়ার পর আমি নিবেদন করি, হুযূর! আমি ফিরে যেতে চাই। হুযূর বলেন, অপেক্ষা করুন। তৃতীয় দিনও আমি আবার একই কথা বললে হুযূর বলেন, চৌধুরী সাহেব! এই ঘোড়াটি নিয়ে যান। আমি নিবেদন করি, হুযূর! এই ঘোড়াটির দাম কত? তিনি (আ.) বলেন, এটিকে ঘাস ও দানা খাওয়াবেন এবং এতে আরোহণ করবেন; এটিই এর মূল্য। কোনো মূল্য লাগবে না। নিয়ে যান এবং আরোহণ করুন।

[আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১০]

হযরত মালিক গোলাম হোসেন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, শহীদ মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব আফগানিস্তান থেকে আসেন এবং তিনি (রা.) হুযূরের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ ব্যক্ত করেন। সেবারও তিনি (রা.) অনেক জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন। তিনি (রা.) একটি পোস্তিনও (চামড়ার তৈরি কোট) নিয়ে আসেন। আমি সংবাদ দিলে হযরত সাহেব (আ.) তাকে ভেতরে ডেকে পাঠান। তিনি (রা.) সেসব জিনিস এবং পোস্তিনও হুযূরের সমীপে পেশ করেন। হুযূর (আ.) খুবই খুশি হন এবং বলেন, মৌলভী সাহেব! আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হুযূর! এই পোস্তিনটি হুযূরের জন্য এনেছি আর মনে চাইছে, হুযূর যেন এটি আমার সামনেই পরিধান করেন। হুযূর (আ.) দাঁড়ান এবং পরিধান করেন। সেটি ছিল লম্বা একটি কোট বা কোটি কিংবা চোগা অর্থাৎ জোব্বা; যা-ই বলা হোক না কেন। সেটি গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ছিল। লম্বা জোব্বাই হবে হয়ত। সন্ধ্যায় খাবার খাওয়ার সময় খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব নিবেদন করেন, হুযূর! মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব খুবই মূল্যবান, উষ্ণ এবং উন্নত মানের একটি পোস্তিন নিয়ে এসেছেন। খাজা সাহেব এই পোস্তিনটি আগেই দেখেছিলেন। হুযূর (আ.) বলেন, খাজা সাহেব! আপনার খুব পছন্দ হয়েছে, আপনিই নিয়ে নিন। তিনি (রা.) বলেন, হুযূর! আপনার অশেষ অনুগ্রহ! এরপর তিনি (আ.) সেই পোস্তিনটি খাজা সাহেবকে দিয়ে দেন।"

[আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪-১৫]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) বলেন, লুধিয়ানার হাফেয নূর আহমদ সাহেব পশমি পোশাক বা উলের পোশাকের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি হুযূর (আ.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একবার তিনি তার ব্যাবসায় চরম লোকসানের সম্মুখীন হন আর ব্যাবসা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তিনি (রা.) অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে চান এবং অন্য কোনো ব্যাবসা করতে চান যেন নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় তিনি (রা.) নিয়মিত পত্রালাপ করতেন এবং নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উর্ধ্বে গিয়ে জামা'তের আর্থিক সেবা করতেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দয়াদাক্ষিণ্য অর্থাৎ অনুগ্রহ, দান, পুরস্কার, দানশীলতা ও বদান্যতা সম্পর্কে আমি শুধু একটি কথাই বলব যে, তিনি (আ.) অল্প দিতে জানতেনই না। তিনি (রা.) নিজের ব্যক্তিগত ঘটনা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমার ব্যাবসায় যখন মন্দা দেখা দেয় এবং যখন আমি সেই সফরের সংকল্প করি যে, অন্য কোথাও গিয়ে ব্যাবসা করব, তখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট কিছু টাকা চাই যে, আমাকে কিছু ঋণ দিন যেন আমি ব্যাবসা শুরু করতে পারি। হুযূর (আ.) একটি ছোট্টো বাক্স তুলে নিয়ে আসেন যেটিতে তিনি টাকা রাখতেন, আর আমার সামনে সেটি রেখে দেন যে, যত চাও নিয়ে নাও। আর হুযূর এতে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। আমি আমার প্রয়োজনানুযায়ী নিয়ে নিই, যদিও হুযূর বারবার বলতে থাকেন যে, পুরোটাই নিয়ে নাও। আসল কথা হলো, বন্ধুদের সাথে তাঁর ব্যবহারই অন্যরকম ছিল। তিনি নিজের সম্পদকে কার্যত বন্ধুদের সম্পদই মনে করতেন এবং এই বিষয়ে তাঁর কষ্ট হতো- যদি কোনো সেবক নিজেকে বহিরাগত মনে করত বা পর ভাবত।

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩০৬-৩০৭]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) বলেন, শেখ মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব সারসাবী, আমার বত্রিশ বছরের পুরানো বন্ধু ও ভাই এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রবীণ সেবক। শুরু থেকেই তার স্বভাব ছিল সুফিদের মতো এবং পুণ্যবানদের স্বভাবের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তা'লীমুল ইসলাম মাদ্রাসায় শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শিক্ষক হিসাবে আছেন। প্রথম দিকে তিনিই অতিথিদের খাবার ইত্যাদি খাওয়াতেন; বলতে গেলে তাকে নাযের যিয়াফত বলা উচিত। তিনি এখানে আসার পর থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষভাবে তার প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং তার প্রয়োজনাদির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করতেন। তিনি তার জামিনদার ছিলেন এবং তার সকল প্রয়োজন পূরণ করতেন। একবার নানাজান মরহুম হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব শেখ সাহেবের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি তার ঋণ ইত্যাদির একটি তালিকা তৈরি করেন যার মাঝে ময়রাদের থেকে নেওয়া ঋণও ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন না যে, তা পরিশোধ হয়ে গেছে। বিষয়টি হযরত সাহেব (আ.) পর্যন্ত গড়ায় যে, তিনি ময়রাদের কাছ থেকে এই ঋণ নিয়ে রেখেছেন লঙ্গারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শুনে হাসেন এবং বলেন, আমি এটি জানি এবং সেই ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে। মীর সাহেব! আপনি চিন্তা করবেন না, বরং প্রতি সপ্তাহে তা পরিশোধ হয়ে যায়। যে ঋণই করা হোক না কেন, তা প্রতি সপ্তাহে শোধ হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শেখ সাহেবকে সাপ্তাহিকভাবে অথবা যখনই তিনি চাইতেন, খরচাদি প্রদান করতেন এবং শেখ সাহেব একেবারে নিঃসঙ্কোচে, যেভাবে এক ছেলে বাবার কাছে গিয়ে বলে, বরং তার চেয়েও নির্দ্বিধায় নিবেদন করতেন, এত পরিমাণ খরচ হয়েছে, আর হুযূর সাথে সাথে তা পরিশোধ করে দিতেন। এ ধরনের রাজকীয় ও পিতৃসুলভ বদান্যতা ছিল তাঁর। [সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩১০-৩১১] এর মাঝে ব্যক্তিগত খরচও থাকত এবং নিশ্চয় লঙ্গারখানার খরচও থাকত।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, হযরত সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সেবকদের একজন ছিলেন। শাহ্ সাহেব মোকাররম সৈয়্যদ নাসের শাহ্ সাহেবের শ্রদ্ধেয় ভাই ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি হিজরত করে কাদিয়ান চলে আসেন এবং দারুয যিয়াফতে থাকতেন। ১৯০০ সালের জুলাই মাসের ঘটনা, তখন তিনি কাদিয়ানে এসেছিলেন। তিনি ৬ই জুলাই, ১৯০০ তারিখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং এই ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন যে, হুযূর, উপদেশমূলক কয়েকটি কথা লিখে দিন। এছাড়াও কিছু ঔষধ এবং একটি কুর্তাও চান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তখন

তীব্র মাথাব্যথা ছিল যেজন্য তিনি নামাযেও আসতে পারেন নি, কিন্তু তীব্র মাথাব্যথা থাকা সত্ত্বেও শাহ্ সাহেবের সেই চিঠির উত্তরে তিনি একটি উপদেশপত্র লেখেন এবং ঔষধ আর কুর্তাও দেন। এই ঘটনা এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতার সবচেয়ে তীব্র অবস্থায়ও নিজের সেবকদের ন্যায্য আবদার পূরণের জন্য সচেষ্ট থাকতেন এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও উপকারের জন্য কষ্ট সহ্য করতেও দ্বিধা করতেন না।

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭-৩০৮]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব লেখেন, তাঁর (আ.) ব্যবহারিক আমল থেকে এটিও জানা যায়, কখনো কখনো তিনি বন্ধুদের আনন্দের উপলক্ষ্যে অত্যন্ত উদারভাবে অর্থ দিতেন। আর এটি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ এবং বদান্যতার একটি অনন্য দিক ছিল। হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানোৗরী সাহেবের নামে যে চিঠিপত্রগুলো তিনি বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন, সেগুলো অধ্যয়নে এবং স্বয়ং মুন্সী সাহেবের বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণ হয় যে, হুযূর (আ.) একবার মুন্সী সাহেবের ওয়ালিমার জন্য এবং দ্বিতীয়বার তাঁর পুত্রসন্তানের আকীকা উপলক্ষ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি বড়ো অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেন আর এই ব্যয়ে তাঁর মাঝে অত্যন্ত আনন্দ ও প্রফুল্লতা লক্ষ করা গেছে। কখনো কখনো মানুষ এই ধরনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হুযূরের সমীপে কিছু অর্থ প্রেরণ করতেন এবং লিখে দিতেন, সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে দাওয়াতের আয়োজন করে দিন। কিন্তু লেখার সময় তারা এই বিষয়টি বেমালুম ভুলে যেতেন, কাদিয়ানে (অল্প) কয়েকজন মানুষকে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয়; কারণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চারপাশে সবসময় অনেক মানুষ উপস্থিত থাকতেন। আর এমনিতে তারা যে অর্থ পাঠাতেন তা অত্যন্ত সামান্য হতো অথবা সবার জন্য যথেষ্ট হতো না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ে তাদের কিছুই লিখতেন না, বরং নিজের পকেট থেকে বড়ো অঙ্কের অর্থ যোগ করে তাদের ইচ্ছা পূরণ করে দিতেন। আর এমন সুযোগ তাঁর জীবনে বহুবার এসেছে, কিন্তু তিনি কখনো এর উল্লেখ ইশারা-ইঙ্গিতেও করতেন না। বরং এমন অনুষ্ঠানে সবসময় এটিই বলতেন, অমুক বন্ধুর পক্ষ থেকে এই দাওয়াত।"

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১০]

কোনো কোনো সময় এটি প্রকাশও পেয়ে যেত; তিনি (আ.) ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলতেন, তার দেওয়া অর্থ কম ছিল বিধায় আমি পূরণ করে দিয়েছি, বাকি খরচ আমি করে দিয়েছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের একটি চিঠিতে হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানোৗরী সাহেবকে তাঁর বিয়ের সময় লিখেছিলেন, আপনার বিয়ে মোবারক হোক। জুমুআর দিন আপনার পক্ষ থেকে অতিথিদের ওয়ালিমার খাবার খাওয়ানো হয়েছে। যেহেতু মেহমান অনেক বেশি ছিলেন, যেমন শেঠ সাহেব অর্থাৎ আব্দুর রহমান মাদ্রাজী সাহেব, শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব (রা.) এবং অন্য অনেক সম্মানিত মেহমান উপস্থিত ছিলেন, আশিজনের অধিক মানুষ হবে, তাই আপনি যে ১০ রুপি পাঠিয়েছিলেন তা যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং এই খুশিতে আমি নিজের পক্ষ থেকে আরও ১০ রুপি যুক্ত করে মোট ২০ রুপির দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছি। খুব ভালো খাবার যেমন- পোলাও, জর্দা, কোরমা ও রুটি ইত্যাদি রান্না করানো হয়েছে। যাহোক, এরপর লেখা রয়েছে, মেহমানরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আপনার কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন। মেহমানদেরও এটি জানানো হয়েছে যে, এটি আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াত। আমার পক্ষ থেকে বা আমিও এতে শরীক হয়েছি- এমনটি বলি নি।

[মাকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩০, মকতুব নং-৬০]

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের একটি চিঠিতে হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানোৗরী সাহেবকে তাঁর পুত্রসন্তানের আকীকা উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন, দুটি খাসি জবাই করা হয়েছে, যেগুলোর মাংস অত্যন্ত চমৎকার ছিল। আর এক ডেগ মাংসের পোলাও এবং এক ডেগ জাফরান মিশ্রিত জর্দা রান্না করা হয়েছে, রুটি এবং মাংসও রান্না করা হয়েছে। প্রায় সত্তরজনের মতো মেহমান ছিলেন। তাদের আপ্যায়ন করা হয়েছে এবং আপনার পুণ্যময় সংকল্পের বরকতে পোলাও ও জর্দা ইত্যাদি উভয় খাবারই অত্যন্ত সুস্বাদু হয়েছে। আর এটিও লেখেন, এই পুরো কাজটি ২৪ রুপির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে আর আমি যেহেতু জানি, আপনি এত অর্থ দিতে পারবেন না, তাই এর অর্ধেক অর্থাৎ ১২ রুপি যদি পাঠাতে চান তবে যে-কোনো সময় পাঠিয়ে দিতে পারেন। আর তিনি (আ.) অত্যন্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তার দাওয়াতের জন্য তাকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন।

[মাকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৪, মকতুব নং-৬৫]

হযরত আহমদ নূর কাবুলি সাহেব বর্ণনা করেন, ১৯০২ সালে আমি যখন কাদিয়ানে আসলাম, তখন মাগরিবের ওয়াক্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার বয়আত গ্রহণ করেন। মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ থেকে আমাকে বাড়ি তৈরির জন্য জমি দান করেন এবং আমার অজান্তেই আমার বিয়ের ব্যবস্থাও করে দেন। আমার অজান্তেই কয়েকজন সাহাবীসহ রুখসাতানার জন্য পাঠিয়ে দেন। আমার জন্য লঙ্গারখানা থেকে এক বস্তা আটা বরাদ্দ করে দেন এবং বলেন, যতদিন আহমদ নূর বেঁচে থাকবে, আমার হিসাব থেকে তাকে এই আটা দিতে থাকবে; আর মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, আহমদ নূরের এই যে আটার খরচ, তা আমি নিজে বহন করব। [আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭]

মিয়া আব্দুর রহীম সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আমি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হই। আমার বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। অচেতন অবস্থায় ছিলাম। তখন আমার জ্যাঠা মরহুম মীরাঁ বখশ সাহেব, হুযূর (আ.) বুট্টর এলাকা থেকে ভ্রমণ করে ফিরে আসার সময় মোরী দরজার চৌরাস্তায় নিবেদন করেন, হুযূর! আব্দুর রহীমকে দেখে যান; সে ভীষণ অসুস্থ। হুযূরের সাথে আরও কতক সদস্য ছাড়াও হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-ও ছিলেন। হুযূর একান্ত দয়াপরবশ হয়ে দরিদ্রকুটিরে প্রবেশ করেন। আমাকে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে নিজের ডান হাত দিয়ে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দেন এবং বলেন, কেন অস্থির হচ্ছো? মারা যাবে না। তখন আমার চোখ খুলে যায়। এরপর হুযূর (আ.) ঘরের ছাদের দিকেও তাকান আর বলেন, আব্দুর রহীম! তুমি এই রোগে মারা যাবে না। তবে এই বাড়ি যা জরাজীর্ণ ও ভগ্ন দশায় আছে, এটিই তোমাকে মেরে ফেলবে। এটির ছাদ চরম দুরবস্থায় আছে। যখন সুস্থ হবে তখন এর ছাদ ঠিক করবে। আর আমার মাকে বলেন, আমার সাথে এসে ঔষধ নিয়ে যান, ঔষধ সেবন করান। আমরা দোয়াও করব। ইনশাআল্লাহ্, সে সুস্থ হয়ে যাবে। অতঃপর আমার মা হুযূরের সাথে হুযূরের বাসায় যান। হুযূর তিন পুরিয়া বা তিন ডোজ ঔষধ দেন। এক পুরিয়া আমি তখনই অর্থাৎ সকাল নয়টা বা দশটা মধ্যে সেবন করি, দ্বিতীয় পুরিয়া সন্ধ্যায় সেবন করি। এই দুই ডোজ সেবনের পর আমি উঠে বিছানায় বসি। তৃতীয় পুরিয়া পরের দিন সকালে সেবন করি। শুধুমাত্র এই তিন পুরিয়া ঔষধ সেবনের পর আমার রোগ পুরোপুরি দূর হতে থাকে। যাহোক তিনি বলেন, পাঁচ-ছয় দিন পর আমি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করি। সামান্য দুর্বলতা রয়ে যায়। তিনি বলেন, সপ্তাহখানেক পর আমি হুযূরের সমীপে উপস্থিত হই। যাইহোক, দুর্বলতা ছিল তাই আমাকে অন্যের সাহায্যে ওপরে নেওয়া হয়। আমি যখন হুযূরের সামনে আসি তখন হুযূর বলেন, তুমি সুস্থ হয়ে গিয়েছ? আমি নিবেদন করি, হুযূরের দোয়া এবং ঔষধের ফলে সেই দিন থেকেই জ্বর প্রভৃতি বিন্দুমাত্র নেই। এরপর হুযূর বলেন, বাড়ির ব্যাপারে কী করলে? আমি নিবেদন করি, মাস-সোয়া মাস অসুস্থ ছিলাম আর আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। বাড়ি কীভাবে বানাবো? আমি ছাদ কেমন করে পরিবর্তন করব? হুযূর বলেন, আমরা বানিয়ে দেবো। আর তখনই মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে ডেকে বলেন, আপনি যখন মাদরাসার কক্ষের জন্য কাঠ আনাবেন তখন আব্দুর রহীমের বাড়ির ছাদের জন্যও কাঠ আনিয়ে সেটি বানিয়ে দেবেন। যা খরচ হবে আমরা দেবো। অতঃপর মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব মিস্ত্রী রুকারামকে আমার বাড়ি দেখার এবং কাঠের আনুমানিক খরচ নিরূপণের জন্য প্রেরণ করেন। সে মৌলভী সাহেবের কাছে এসে বলে, বাড়িতে দশটি কড়িকাঠ লাগবে। মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব হুযূরের কাছে নিবেদন করেন, কাঠের জন্য ত্রিশ টাকা লাগবে। হুযূর মৌলভী সাহেবকে ত্রিশ টাকা দিয়ে দেন আর আমার বাড়ি তৈরি হয়। তিনি বলেন, এছাড়াও মজুরি ও অন্যান্য যে খরচ হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি না- তা কত ছিল। সব খরচ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দিয়েছেন। [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৪-১৭৫]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, সীরাতে তাইয়্যেবার সোজাসাপ্টা সারাংশ বর্ণনা করে উল্লেখ করেন, আমাদের বড়ো মামা মরহুম হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) আমার বলার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চরিত্র ও গুণাবলি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত কোমল ও দয়ালু ছিলেন, দানশীল ছিলেন, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, ভীষণ সাহসী ছিলেন অর্থাৎ মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ছিলেন। বিপদাপদের সময় যখন মানুষের মন দমে যেত, তিনি সিংহপুরুষের মতো অগ্রসর হতেন। মার্জনা করা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, বদান্যতা, বিনয়, বিশ্বস্ততা, সরলতা, আল্লাহ্র প্রতি গভীর প্রেম, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, দ্বীনের মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, অঙ্গীকার রক্ষা, উত্তম সামাজিক আচরণ, ব্যক্তিত্বের মর্যাদা, আত্মমর্যাদাবোধ, সাহস, দৃঢ় সংকল্প, সদাহাস্য মুখমণ্ডল এবং উদার ও প্রফুল্ল ব্যবহার- এসবই ছিল তাঁর অনন্য ও উজ্জ্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।"

তিনি লেখেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমার দুবছর বয়স থেকে দেখেছি আর তিনি আমার চোখের সামনে থেকে তখন বিদায় নেন অর্থাৎ তিনি (আ.) তখন মৃত্যুবরণ করেন যখন আমার বয়স সাতাশ বছর। কিন্তু আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁর (আ.) চেয়ে উত্তম, তাঁর চেয়ে অধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী, তাঁর চেয়ে উচ্চমার্গের পুণ্যবান ব্যক্তি, তাঁর চেয়ে অধিক স্নেহশীল, তাঁর চেয়ে বেশি খোদা ও মহানবী (সা.)-এর প্রেমে বিভোর কাউকে দেখি নি। তিনি (আ.) এক জ্যোতি ছিলেন যা মানুষের জন্য পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করেছিল, আর তিনি দয়ার বৃষ্টি ছিলেন যা সুদীর্ঘকাল খরার পর পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষিত হয়ে সেটিকে সবুজ-সতেজ করে দিয়েছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেও নিজের এই সাক্ষ্য প্রকাশ করে বলেন, মীর সাহেব যা বর্ণনা করেছেন- আমি নিজেও তার চাক্ষুষ সাক্ষী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এসব উচ্চ নৈতিক গুণের অধিকারী করুন, যেগুলো সৃষ্টি করানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে তাঁকে (আ.) আবির্ভূত করেছিলেন।

[আল ফজল-ইন্টারন্যাশনাল, ১৭ই জুলাই, ২০২৬)

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্নেহ-মমতা ও দানশীলতা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩ জুলাই, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৩ ওয়াফা, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্নেহ-মমতা ও দানশীলতার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, তাঁর (আ.) দান ছিল এক সীমাহীন সমুদ্র এবং তাঁর হাত ছিল মুক্তা বর্ষণকারী মেঘের মতো। তা বর্ষিত হতো এবং তৃষ্ণা নিবারণ করত, আর রমযান মাসে এর মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেত। আর অতি গোপনে হুযূর (আ.) অভাবগ্রস্তদের দান করতে থাকতেন, আর অত্যন্ত মূল্যবান সব বস্তুও অন্যকে দিয়ে দিতে তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না।

তাঁর জীবনের সব পর্যায়েই এই অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যাদিষ্ট হওয়া ও দাবির আগেও এটি আপন মহিমায় প্রোজ্জ্বল ছিল। মিয়াঁ গাফফারা সাহেব তথা আব্দুল গাফফার কাশ্মীরী, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুগ্রহ এবং মানবিকতার কথা উল্লেখ করে নিজ বিবৃতিতে বলেন, যখন তার বিয়ে হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে সাহায্য করার জন্য দুটি মূল্যবান অলঙ্কার দিয়েছিলেন। এটি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হবার পূর্বেকার কথা, যখন তিনি নিভৃতচারী হিসেবে জীবনযাপন করতেন।

হযরত শেখ সাহেব লেখেন, এটিই একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়, এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

এমন কোনো পরিস্থিতি তাঁর সামনে আসে নি যখন তাঁর (আ.) কাছে কেউ কিছু চেয়েছে আর তিনি তা দেন নি, অথবা তিনি কারো প্রয়োজন উপলব্ধি করে তার চাওয়া বা আবেদন ছাড়াই তাকে সাহায্য করেন নি। তিনি ছিলেন পরম মার্গের দানশীল। [সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা: হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি, ৩য় পৃ: ৩১২]

হযরত বশীর ভাট্টি সাহেবের মাতা বর্ণনা করেন, একবার আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ (রা.)-র বিয়ের সময় এক গায়িকা নারী ঢোল নিয়ে হুযূরের বাড়িতে চলে আসে এবং তা বাজাতে শুরু করে। এটি করে সে (টাকাপয়সা) কিছু পেতে চাইছিল, কারণ এটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল, সেখানে সাধারণত এই রীতি প্রচলিত ছিল। হুযূর যখন ঢোলের শব্দ শোনেন, সাথে সাথে সেদিকে মনোযোগী হন এবং বলেন, তাকে বলো- সে যেন এটি না বাজায় এবং তা বন্ধ করাও; আর সে যা চায় তাকে দিয়ে দাও। অতঃপর তাকে চার-পাঁচ রুপি দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সে বলতে থাকে, শীতকাল চলে এসেছে এবং আমার শীত লাগে; তখন তিনি তাকে একটি লেপও পাইয়ে দেন, কিন্তু ঢোল বাজানো বন্ধ করিয়ে দেন।

[আসহাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪১]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম এই বিষয়টি মনে রাখা উচিত, তাঁর (আ.) কোনো বিশেষ ধরনের পোশাকের প্রতি শখ ছিল না। জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁর কাছে উপহারস্বরূপ অনেক সাধারণ ও সেলাই করা পোশাক আসত, বিশেষ করে কোট, ওয়েস্টকোট এবং পায়জামা-পাঞ্জাবি ইত্যাদি। এগুলো সাধারণত লাহোর নিবাসী শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব প্রত্যেক ঈদ এবং কুরবানীর ঈদের সময় সাথে করে উপহার হিসেবে নিয়ে আসতেন, তিনি (আ.) সেগুলোই ব্যবহার করতেন। তবে এসবের বাইরে মাঝে মাঝে তিনি নিজেও পোশাক বানিয়ে নিতেন। পাগড়ি তো সাধারণত তিনি নিজেই কিনে বাঁধতেন। যেভাবে পোশাক বানানো হতো এবং ব্যবহৃত হতো, ঠিক তেমনি সাথে সাথে তা খরচও হয়ে যেত; অর্থাৎ তাবাররুক (বা পুণ্য স্মৃতিচিহ্ন) হিসেবে লোকেরা সব সময়ই তা চাইতে থাকত। মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতিও তৈরি হতো যে, তিনি একটি কাপড় তাবাররুক হিসেবে কাউকে দিয়ে দিলে, সাথে সাথে অন্য একটি বানিয়ে তা পরতে হতো। আর কিছু বুদ্ধিমান লোক এমনটিও করত যে, উদাহরণস্বরূপ- নিজের একটি কাপড় পাঠিয়ে দিল এবং সাথে নিবেদন করল, হুযূর, আপনার পরিহিত কাপড়টি তাবাররুক হিসেবে দিয়ে দিন।" [সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড,২য় ভাগ, পৃ: ৪১৬]

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) লেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেছিলেন, আমার কাছে একটি ছোটো আকারের পবিত্র কুরআন ছিল, অর্থাৎ একটি ছোটো কুরআন শরীফ ছিল, যার হরফগুলোও অনেক স্পষ্ট ছিল এবং সেটি আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু এক ব্যক্তি সেটি চায়, তখন আমি তাকে সেটি দিয়ে দিই যেন তার চাওয়া প্রত্যাখ্যাত না হয়।"

[যিকরে হাবীব, প্রণেতা- হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব, পৃ: ১৩৮]

হযরত কুরাইশী শেখ মুহাম্মদ সাহেব- যিনি ডাকপিয়ন ছিলেন এবং কাদিয়ানের বাসিন্দা ছিলেন- তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বিতরণের জন্য অনেকগুলো মানি অর্ডার নিয়ে যাই এবং হুযূরকে তাঁর মানি অর্ডারের টাকা বুঝিয়ে দেবার পর শহরে বিলির কাজ করতে থাকি। যখন চারটার দিকে ডাকঘরে ফিরে আসি এবং পোস্টমাস্টারকে বিলি করা মানি অর্ডারের হিসাব দিতে যাই, তখন হিসাব করে দেখি, ভুলবশত আমি কোথাও ছয় রুপি বেশি দিয়ে দিয়েছি। এতে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি, কারণ হুযূরকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটিই ছিল একটি বড়ো অঙ্ক। তাই আল্লাহ্ দিত্তা নামের সেই পোস্টমাস্টার- যে একজন ধর্মান্ধ অআহমদী ছিল- সে বলে, সবচেয়ে ভালো হয় তুমি গিয়ে মির্যা সাহেবের কাছ থেকে জেনে আসো। আমার মন যদিও চাচ্ছিল না যে, আমি আবার গিয়ে হুযূরকে কষ্ট দিই, কিন্তু তার বারংবার পীড়াপীড়িতে আমি হুযূরের সমীপে উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি, হুযূর! আজ ভুলবশত আমি কোথাও ছয় রুপি বেশি দিয়ে দিয়েছি। হুযূর বলেন, মিয়াঁ! আমি তো জানিই না- কত টাকা গ্রহণ করা হয়েছিল! আর আমি তো এর মধ্য থেকে কিছু খরচও করে ফেলেছি, অর্থাৎ লোকদেরকে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যাহোক, তুমি গরিব মানুষ, আমি তোমাকে এই টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। তবে ভবিষ্যতে সতর্কতার সাথে কাজ করবে, কারণ তুমি গরিব। এই ঘটনা থেকে হুযূরের উত্তম চরিত্র, বদান্যতা এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।"

[আসহাবে আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৭-৩৮]

হযরত মীর মাহদী হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমার কাছে 'চশমায়ে মসীহী' পুস্তকের একটি কপি চান। আমি বলি, হযরত সাহেব (আ.) বলেছেন, দপ্তরে এতগুলো কপি থাকা উচিত, কারণ মাঝে মাঝে সরকার তলব করে বা যে বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে তার কপিগুলো চেয়ে পাঠায়। তাই এখন আপনাকে দেবার মতো আর কোনো অতিরিক্ত কপি নেই। আপনি হযরত সাহেবের (আ.) কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিতে পারেন। তখন মৌলভী সাহেব হুযূরের সমীপে পত্র লেখেন। সে চিঠির সারমর্ম এরূপ ছিল- দপ্তরে 'চশমায়ে মসীহী'র মাত্র বিশটি কপি অবশিষ্ট আছে এবং আমার একটি কপির প্রয়োজন। যদি কোনো অসুবিধা না হয় তবে আমাকে একটি কপি দেওয়া হোক। হুযূর (আ.) বলেন, আপনি একটি কপি নিয়ে নিন। এরপর তিনি সেই চিঠির ওপরেই তা লিখে স্বাক্ষর করে দেন। [আসহাবে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৯]

এতে যেমন সাহাবীদের স্পষ্টবাদিতারও পরিচয় পাওয়া যায়- কীভাবে তিনি (রা.) পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে, এতগুলো কপি আছে এবং আমার একটি প্রয়োজন, আর দপ্তর থেকে এই কথা বলছে; তবে হুযূর যদি দয়াপরবশ হন তবে যেন দেওয়া হয়- এটি ছিল তার স্পষ্টবাদিতা। পাশাপাশি এখানে হুযূর (আ.)-এর অনুগ্রহেরও পরিচয় পাওয়া যায় যে, যদিও তা সংরক্ষিত বা রিজার্ভ হিসেবে রাখা ছিল, যে-কোনো সময় প্রয়োজন পড়তে পারত, কিন্তু তিনি আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন নি।

হযরত আকদাসের (আ.) কাছে মাঝে মাঝে পণ্ডিত মোহন লাল, যে সেই সময় এক বুদ্ধিমান যুবক ছিল, লেখরাম সাহেবের কোনো চিরকুট ইত্যাদি নিয়ে যেত। যেহেতু হযরত আকদাসের পরিবারের সাথে মোহন লালের পুরনো সম্পর্ক ছিল, তাই হযরত আকদাস পণ্ডিত মোহন লাল সাহেব যখন যেত, তাকেও খালি হাতে ফিরতে দিতেন না। কিছু না কিছু উপহার অবশ্যই দিয়ে দিতেন, যেমন ফলমূল বা চিনি, যা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের হতো এবং সে যুগে এটি একটি বিশেষ উপহার হিসেবে গণ্য হতো। শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) বলেন, পণ্ডিত মোহন লালের পরিবারের সাথে আমারও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তা তার বাবার যুগ থেকেই ছিল। সে আমার কাছে সেই দিনগুলোর ঘটনা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে সবসময় বলত, হযরত সাহেব (আ.) অনেক অনুগ্রহ করতেন এবং সবসময় হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন, আর কখনও খালি হাতে ফিরতে দিতেন না।

একবার হযরত সাহেব (আ.) আমাকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের আপেল দেন; আমি তা নিয়ে যাই। পণ্ডিত লেখরামেরও এই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমি যখন ফিরে যেতাম সে অবশ্যই জিজ্ঞেস করত, কী এনেছ? আমি যখন বলি, আপেল এনেছি তখন সে অনেকটা লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, দাও দাও, আমিও খাই! পণ্ডিত মোহন লাল বলে, আমি হাসতে হাসতে তাকে বলি, শত্রুর বাড়ির জিনিস তোমার খাওয়া উচিত নয়। তুমি তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘোর শত্রু, (তাঁর বিরুদ্ধে) বিভিন্ন কথা বলো; তুমি কেন তাঁর বাড়ির জিনিস চাইছ? তখন সে চট করে আমার হাত থেকে আপেল নিয়ে নেয় এবং খেতে আরম্ভ করে দেয়। একপ্রকার ছিনিয়েই নেয় এবং খাওয়া শুরু করে দেয়। তিনি বর্ণনা করেন, মোটকথা, সে সবসময় হযরত সাহেবের (আ.) কাছ থেকে ভালোবাসা এবং মানবিকতাই দেখেছে।

[হায়াতে আহমদ, প্রণেতা-ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৬]

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূরের (আ.) কাছে কস্তুরী বা মৃগনাভি থাকত। একবার আমি নিবেদন করি, হুযূর! আমার কস্তুরী প্রয়োজন।

হুযূর পুরো কৌটাই আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেন, এর থেকে যতটুকু চান নিয়ে নিন। আমি তা থেকে সামান্য একটু নিই। তিনি মুচকি হেসে বলেন, এটি তো কিছুই নয়; আর এরপর হুযূর নিজেই এক-দেড় তোলার মতো কস্তুরী আমাকে দিয়ে দেন।"

[আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৩]

এটি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু; কস্তুরী আজও মূল্যবান এবং ঔষধ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোনো বস্তুর মূল্যবান হওয়ার প্রতি তাঁর (আ.) কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি তো কেবল নিজের মহানুভবতাই প্রদর্শন করেছেন।

বন্ধুদের প্রতি তাঁর (আ.) সমবেদনা ও বদান্যতার একটি ঘটনা

হাকীম মুফতী ফযলুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করে এবং এর সপ্তম দিন মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে তার অর্থাৎ স্ত্রীর মাঝে খিঁচুনির লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেহেতু সেই দিনগুলোতে এই মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই এর প্রতি অনেক মনোযোগ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, আমি মাগরিবের পর ছুটে হযরত সাহেবের সমীপে উপস্থিত হই এবং তাঁর কাছে নিবেদন করি, আমার স্ত্রীর এই অবস্থা। তিনি (আ.) বলেন, এটি তো এক মারাত্মক রোগের পূর্বাভাস। তুমি তাড়াতাড়ি তাকে দশ রতি হিং খাইয়ে দাও। তিনি হিং-এর ঔষধের কথা বলে দেন এবং বলেন, এক-দেড় ঘণ্টা পর আমাকে সংবাদ জানাবে। আমি এশার পর আবার উপস্থিত হই এবং নিবেদন করি, রোগের প্রকোপ আরও বেড়ে গেছে। কমার পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন তিনি (আ.) বলেন, দশ রতি কুইনাইন খাইয়ে দাও। এক ঘণ্টা পর আবার আমাকে অবহিত করবে। আর এটি মনে করবে না- আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কোনো দ্বিধা না করেই পুরুষদের (অংশের) সিঁড়ি থেকে আমাকে ডাক দেবে। এক ঘণ্টা পর আমি আবার যাই এবং নিবেদন করি, কোনো উপশম হয় নি। তখন তিনি (আ.) বলেন, দশ রতি কস্তুরী দিয়ে দাও। আমি নিবেদন করি, এ সময় কস্তুরী কোথায় পাবো? হুযূর (আ.) এক মুঠো কস্তুরী নিয়ে আসেন এবং বলেন, এখানে দশ রতি হবে। আমি নিবেদন করি, হুযূর, এখানে তো বেশি আছে! তিনি বলেন, নিয়ে যাও, পরে কাজে লাগবে। আমি তা নিয়ে নিই এবং দশ রতি রোগিণীকে সেবন করাই। এক ঘণ্টা পর আবার যাই এবং নিবেদন করি, রোগের প্রকোপ আরও বেড়েছে। তিনি বলেন, এখন দশ তোলা ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দাও। তিনি এভাবে বিভিন্ন ওষুধ পরিবর্তন করতে থাকেন। আমি ফিরে এসে দশ তোলা ক্যাস্টর অয়েল সেবন করাই। এর পর তার প্রচণ্ড বমি হয়, আর এই রোগে বমি হলো শেষ পর্যায়। বমির পর তার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়, ঘাড় পেছনের দিকে বেঁকে যায়, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং বাকশক্তি রহিত হয়ে যায়। আমি আবার ছুটে গিয়ে সিঁড়িতে উঠি। হুযূর (আ.) আমার ডাক শুনে দরজা খুলে দেন এবং বলেন, কী ব্যাপার, সব ঠিক আছে তো? আমি নিবেদন করি, এখন তো অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঘাড় বেঁকে গেছে, এটি মেনিনজাইটিসের একটি লক্ষণ, চোখে দৃষ্টি নেই, বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জাগতিক যত অস্ত্র ছিল তা তো আমরা প্রয়োগ করেছি। এখন একটি মাত্র অস্ত্রই অবশিষ্ট আছে আর তা হলো দোয়া। তুমি যাও, আমি দোয়া থেকে তখনই মাথা তুলব যখন সে আরোগ্য লাভ করবে। কী অপরিসীম স্নেহ তাঁর! তিনি বলেন, আমি একথা শুনে ফিরে আসি এবং স্ত্রীকে বলি, এখন তোমার আর কীসের চিন্তা! এখন তো দায়িত্ব গ্রহণকারী নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, তখন রাত দুটো বেজে গিয়েছিল। আমি বাড়িতে আসি এবং রোগিণীকে সেই অবস্থায় রেখেই অন্য একটি কক্ষে গিয়ে চারপাই বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, আমি এখন দোয়া করব। অতএব এখন আমার আর কোনো কাজ নেই। তিনি বলেন, সকালে কোনো বাসনের শব্দে আমার ঘুম ভাঙে। আমি তাকিয়ে দেখি, আমার পায়ের দিকে আমার স্ত্রী কিছু বাসনপত্র গোছাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করি, (এখন) কী অবস্থা? সে বলে, আপনি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর দুঘণ্টা পরই আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি কৃপা করেছেন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

[সীরাত আহমদ, প্রণেতা-কুদরাতুল্লাহ্ সানোরি সাহেব, পৃ: ১৭০-১৭২]

এই ঘটনায় বন্ধুদের প্রতি তাঁর সমবেদনা এবং বদান্যতা- দুটো ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ মানের পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) লেখেন, কাদিয়ানে নিহাল সিং নামের এক বেকুব বা নির্বোধ, অভদ্র ব্যক্তি ছিল। সে যৌবনকালে কোনো এক সেনাবাহিনীতে চাকরিও করত এবং পেনশন পেত। তার বাড়িটি জনাব খান বাহাদুর মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বৈঠকখানার ঠিক দেয়াল ঘেঁষে লাগানো ছিল। সে জামা'তের এক ঘোরতর শত্রু ছিল। তারই প্ররোচনায় হযরত হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং অন্য কয়েকজন আহমদীর বিরুদ্ধে একটি জঘন্য, মিথ্যা ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সে সবসময় অন্য লোকেদের সাথে মিলে আহমদীদের বিরক্ত করত এবং গালিগালাজ করা তার নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় ছিল। ঠিক এই দিনগুলোতেই যখন মামলা চলছিল, তার ভাতিজা সান্তা সিংয়ের স্ত্রীর জন্য কস্তুরীর প্রয়োজন পড়ে। আর অন্য কোথাও থেকে যে শুধু কস্তুরী পাওয়া যাচ্ছিল না তা-ই নয়, বরং এটি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তুও ছিল। সেই পরিস্থিতিতে সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দরজায় যায় এবং কস্তুরী চায়। এ সেই ব্যক্তিই- যে ঘোর বিরোধী ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার ডাক শুনে সাথে সাথেই বাইরে আসেন এবং তাকে সামান্যতমও অপেক্ষায় না রেখে তার আবেদন শোনামাত্র তিনি ভেতরে চলে যান এবং বলেন, দাঁড়াও, আমি এখনই নিয়ে আসছি। অতঃপর তিনি প্রায় আধা তোলার মতো কস্তুরী এনে তার হাতে তুলে দেন।"

[সীরাত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ৩য় ভাগ, পৃ: ২৯৫-২৯৬]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) লেখেন, যখন এই দেশে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ওহী এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি ওষুধ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। হুযূর (আ.) এর নাম রাখেন 'তিরইয়াক-এ-ইলাহী'। আর এই ওষুধের কোনো নির্ধারিত ব্যবস্থাপত্র বা উপাদান-তালিকা ছিল না, বরং যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রচ্ছন্ন ওহী নির্দেশনা দিয়েছে, তিনি (আ.) সেভাবেই এর উপাদানগুলো সংগ্রহ ও ব্যবহার করতেন এবং চিকিৎসাবিদ্যার যে সাধারণ প্রচলিত রীতি রয়েছে, তার পরোয়া করতেন না। আর উপাদানসমূহের ওজন ও পরিমাপ সেই মূল ঐশী জ্ঞানের অধীনে পরিচালনা করতেন। যেভাবে নির্দেশনা আসত, তিনি (আ.) ততটুকু পরিমাণই তাতে যুক্ত করতে থাকতেন। এই ওষুধে কয়েক হাজার টাকার তো মণিমাণিক্যই দেওয়া হয়েছিল এবং অনেক মূল্যবান ওষুধ মেশানো হয়েছিল। যখন এই ওষুধ তৈরি হয়ে যায়, তখন হুযূর (আ.) অত্যন্ত উদারতার সাথে তা বণ্টন করেন এবং কারো কাছ থেকে দানা বা বিন্দু পরিমাণও কিছু গ্রহণ করেন নি, কিছুই নেন নি। বরং বাইরে থেকে যারা চাইত, তাদেরকে নিজ খরচে পার্সেল রেজিস্ট্রি করে ওষুধ পাঠিয়ে দিতেন।

ডাক্তার সাদেক সাহেব একবার বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি দুই-তিন মাশা তিরইয়াকের জন্য আবেদন করেছিল, তিনি (আ.) তাকে অনেক বেশি পরিমাণে তা কৌটায় ভরে রেজিস্ট্রি করিয়ে পাঠিয়ে দেন। ইরফানী সাহেব লেখেন, আমিও নিবেদন করেছিলাম, তখন তিনি (আ.) আমাকেও অনেক পরিমাণে দান করেছিলেন। কেবল তিরইয়াক সম্পর্কেই হুযূরের (আ.) এমন আচরণ ছিল না, বরং ঔষধপত্রের বিষয়ে হুযূরের (আ.) আদর্শ এমন ছিল যে, অনেক সময় পুরো বোতলই দিয়ে দিতেন এবং কখনও কখনও তিনি (আ.) অত্যন্ত মূল্যবান ও উন্নত মানের কস্তুরী নিজের চরম শত্রুদেরও দিয়ে দিয়েছেন। যার মাঝে একটি ঘটনা এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।

[সীরাত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা- হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় ভাগ, পৃ: ৩০৯-৩১০]

হযরত শেখ মুহাম্মদ নাসিম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমাদের কস্তুরীর প্রয়োজন হয়। কাদিয়ানে সে দিনগুলোতে এটি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

হযরত সাহেবের (আ.) কাছে চাইলে তিনি (আ.) প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি দান করেন।" [আসহাবে আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৬]

মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলভী (রা.) বর্ণনা করেন, এক বন্ধু অনেক পরিশ্রম, চেষ্টা ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কোনো এক ব্যক্তির কাছ থেকে কুশতা-র (ভস্ম বা বিশেষ ইউনানী ওষুধ) একটি ব্যবস্থাপত্র বা ফর্মুলা সংগ্রহ করেন এবং কুশতা তৈরি করে হুযূরের (আ.) সমীপে পেশ করেন এবং ব্যবস্থাপত্রটিও দিয়ে দেন। অন্য এক বন্ধু আমাকে বলেন, সেই ব্যবস্থাপত্রটি সংগ্রহ করা হোক। কিন্তু ওই বন্ধু কাউকে তা বলতেন না। আমি হযরত সাহেবের (আ.) কাছে যাই এবং নিবেদন করি, অমুক বন্ধু হুযূরকে কোনো কুশতা দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, ওই যে শিশি রাখা আছে, ওটি নিয়ে নাও। আমি নিবেদন করি, এর ব্যবস্থাপত্র? হুযূর (আ.) বলেন, সেটিও ওখানে সাথেই রাখা আছে। সুতরাং সেই কুশতাটি ব্যবস্থাপত্রসহ আমি নিয়ে আসি এবং ওই বন্ধুকে দেখাই যে, দেখো! তুমি বলছিলে না; এই যে দেখো, আমি নিয়ে এসেছি! সে হুযূরের (আ.) কাছে গিয়ে বলে, হুযূর কি তা দিয়ে দিয়েছেন? তিনি (আ.) বলেন, সে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে। সে চাইতে এসেছিল, আমি দিয়ে দিয়েছি। তারপর হুযূর (আ.) আমাকে এ-ও বলেন যে, মির্যা সাহেবের অর্থাৎ হুযূরের মরহুম পিতার বায়ায (নোটবুক বা ফর্মুলার খাতা) আমার কাছে আছে। আপনার তো ব্যবস্থাপত্র চাই, তাই না? আমি আমার পিতার বায়ায আপনাকে দিচ্ছি, এতে অত্যন্ত চমৎকার সব ব্যবস্থাপত্র আছে, সেটিও আপনি নিয়ে নিন। এরপর আমার আর সেই বায়ায নেওয়ার কথা মনে ছিল না, যদিও হুযূর (আ.) তা দান করতে চেয়েছিলেন।"

[আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৪-২১৫]

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) নিজের একটি চিঠিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে লেখেন, গর্ভাবস্থার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে আমার বাড়িতে এমন কষ্ট চলছে যে, বাড়িতে খাবার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। রুটি তন্দুরে বানিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু তরকারির জন্য সমস্যা হচ্ছে। তাই আবেদন করছি, কিছুদিনের জন্য লঙ্গার থেকে তরকারি নেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। এর জবাবে হযরত আকদাস (আ.) লঙ্গারের ইনচার্জ মিয়াঁ নাজমুদ্দীন সাহেবকে লেখেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন, মুফতী সাহেবকে যেন লঙ্গার থেকে দুই বেলা উত্তম তরকারি দিয়ে দেওয়া হয় এবং এটি বিশেষ নির্দেশনা।

[যিকরে হাবীব, প্রণেতা-হযরত মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব, পৃ: ২৮১]

হযরত মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য নাসীবাইন-এ একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর ইচ্ছা করেন। এতে মির্যা খোদা বখশ সাহেব এবং মৌলভী কুতুবুদ্দীন সাহেব ছিলেন, আর তৃতীয় সদস্য আমার পিতা মিয়াঁ জামালুদ্দীন সাহেব ছিলেন। লটারির মাধ্যমে এরা সবাই নির্ধারিত হয়েছিলেন। হুযূর (আ.) কাপড় ইত্যাদি তৈরির জন্য তিনজনকেই মাথাপিছু পঞ্চাশ রুপি করে দেন এবং এরপর হুযূর (আ.) একটি বিদায়ী সভার আয়োজন করেন। যাহোক, পরবর্তীতে কিছু কারণবশত এই প্রতিনিধিদলের যাত্রা স্থগিত করতে হয়। তিনি বলেন, যখন প্রতিনিধিদলের যাত্রা স্থগিত হয়ে যায় তখন আমার পিতা সেই পঞ্চাশ রুপি হুযূরের (আ.) কাছে ফেরত

দিতে যান। হুযূর (আ.) বলেন, আমরা যখন কাউকে কিছু দিয়ে দিই, তা আর ফেরত নিই না। যখন পিতা বাড়িতে ফিরে আসেন তখন এই ঘটনাটি তিনি আমাকেও শোনান।
[আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪০]

হযরত মালিক গোলাম হুসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, এটি ১৮৯৪ বা ১৮৯৫ সালের জলসা সালানার কথা। আর হুসামুদ্দীন সিয়ালকোটি সাহেব, যিনি রান্না করা এবং খাওয়ার বিষয়ে খুব শৌখিন ছিলেন, সেই সময় জলসায় এসেছিলেন। তিনি হযরত সাহেবের (আ.) সমীপে 'শব দেগ'-এর অনেক প্রশংসা করেন। তিনি নিবেদন করেন, হুযূর! 'শব দেগ' অত্যন্ত সুস্বাদু রান্না হয়। 'শব দেগ' হলো এমন এক খাবার যাতে বিভিন্ন ধরনের মাংস থাকে, বিভিন্ন শাকসবজি ইত্যাদিও এতে দেওয়া হয় এবং সারারাত ধরে রান্না করা হয়। হযরত সাহেব (আ.) আমাকে ডাকেন এবং বলেন, শাহ সাহেব যা পছন্দ করেন, যে পরিমাণ উপাদান চান, তার জন্য জোগাড় করে দাও। মাংস তো এখানেই পাওয়া যেত, তাই এখান থেকে নেওয়া হয়, আর শালগম বাটালা থেকে আনানো হয়। সন্ধ্যার দিকে প্রায় চারটি বড়ো হাঁড়ি চুলোয় বসিয়ে দেওয়া হয় এবং চালও সেখানকার দোকান থেকে- যেটি একটি ভালো ও বিখ্যাত দোকান ছিল- প্রায় দুই-আড়াই মণ নেওয়া হয়। আর সকালে সৈয়্যদ হুসামুদ্দীন সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী অতিথিদের খাবার খাওয়ানো হয়।
[আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩০]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) আমাকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, একবার জলসা সালানার সময় খরচ ফুরিয়ে যায়। সে যুগে জলসা সালানার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠানো হতো না, অর্থাৎ নিয়মিত চাঁদার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ পকেট থেকেই এর খরচ বহন করতেন। মরহুম মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) লঙ্গারের ইনচার্জ ছিলেন; তিনি একদিন এসে নিবেদন করেন, রাতের বেলা অতিথিদের জন্য কোনো রসদ নেই। অর্থাৎ খরচ ফুরিয়ে গেছে, টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেছে, মালপত্র শেষ হয়ে গেছে। এখন অতিথিদের জন্য কোনো খাবারের ব্যবস্থা নেই। হুযূর (আ.) বলেন, বিবি সাহেবার কাছ থেকে এমন কোনো অলঙ্কার নিয়ে নিন যা দিয়ে সংকুলান হতে পারে। অর্থাৎ হযরত আম্মাজানের কাছ থেকে অলঙ্কার নিয়ে নিন যা দিয়ে সংকুলান হয় বা পর্যাপ্ত হয়, তা বিক্রি করে রসদের ব্যবস্থা করে নিন। অতঃপর অলঙ্কার বিক্রি করা হয় অথবা তা বন্ধক রেখে মীর সাহেব টাকা নিয়ে আসেন এবং মেহমানদের জন্য রসদ জোগাড় করে দেন। দুদিন পর মীর সাহেব আবার রাতের বেলা আমার (অর্থাৎ মুন্সী জাফর আহমদ সাহেবের) উপস্থিতিতেই বলেন, আগামীকালের জন্য আবার কিছুই নেই। সেই অলঙ্কার বিক্রির টাকা দিয়ে দুদিন তো পার হয়ে গেল; এখন কী করব? তিনি (আ.) বলেন, আমরা তো বাহ্যিক উপকরণের বিবেচনায় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম; আমাদের কাছে যা কিছু ছিল আমরা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের আর দরকার নেই; তারা যাঁর অতিথি- আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে আসা লোক এরা, আল্লাহ্'র অতিথি- তিনি নিজেই এখন ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি বলেন, পরের দিন সকাল আটটা-নয়টার দিকে যখন ডাকপিয়ন আসে তখন হুযূর (আ.) মীর সাহেবকে এবং আমাকে ডাকেন। ডাকপিয়নের হাতে প্রায় দশ-পনেরোটি মানি অর্ডার ছিল যা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিল। কোনো কোনোটা একশ, কোনোটা পঞ্চাশ রুপির মানি অর্ডার; আর তাতে লেখা ছিল, আমরা উপস্থিত হতে অপারগ, অতিথিদের খরচের জন্য টাকা পাঠানো হচ্ছে। তিনি (আ.) সেগুলো গ্রহণ করে 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা) সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন, সে সময় আরও কয়েকজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি (আ.) বলেন, যেমন একজন দুনিয়াদার ব্যক্তির নিজের সিন্দুকে রাখা টাকার ওপর ভরসা থাকে যে, যখন চাইব বের করে নেব- তার চেয়েও বেশি ভরসা ওই লোকদের আল্লাহ্ তা'লার ওপর থাকে, যারা আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করে। আর ঠিক এমনটিই হয় যে, যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, খোদা তা'লা সাথে সাথে পাঠিয়ে দেন। [সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৯৭-৯৮]

কাজেই, তিনিও (আ.) যখন বলেন, এরা আল্লাহ্ তা'লার মেহমান, তাঁরই খাতিরে এসেছে, এরপর তিনি নিশ্চয়ই দোয়াও করেছিলেন, আর তাঁর তাওয়াক্কুলও পরিপূর্ণ ছিল; ফলে আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাও করে দেন।

হযরত মিয়াঁ রহমতুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (আ.) বলতেন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি একসাথে আসছে, তবুও মানুষ তওবা করছে না। তারা অনাহারে মারা যাচ্ছে। এর তিন বছর পর দেশে মারাত্মকভাবে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে হুযূর (আ.) বলতেন, হাদীসে এর উল্লেখ আছে যে, মসীহ্ মওউদের (আ.) সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। মহানবী (সা.)-এর বাণী এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। আর অন্যদিকে, মৌলভী সাহেব অর্থাৎ খলীফা আউয়াল (রা.)-কে তিনি নির্দেশ দেন, যতটা সম্ভব শস্য সংগ্রহ করা হোক। তখন লঙ্গারের ব্যবস্থাপনা হুযূরের (আ.) হাতে ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। যে-সব খাদ্যশস্য ইত্যাদি ছিল, যেহেতু দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ও ভয় ছিল, তাই তিনি (আ.) বলেন, আগে খাদ্যশস্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করো। আর হযরত খলীফা আউয়ালকে (রা.) এই কাজ অর্পণ করেন, তিনি যেন সাথে সাথে সেগুলো কিনে নেন। হুযূর (আ.) মৌলভী সাহেবকে বলে দেন, আর হুযূরের (আ.) নির্দেশে মৌলভী সাহেব আমার কাছ থেকে লঙ্গারখানার জন্য ত্রিশ বস্তা (শস্য) ক্রয় করেন। চাঁদার স্বল্পতা ছিল; বাড়িতে যত অলংকার ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সবই বিক্রি করে দেন। গম কেনার জন্য তিনি মৌলভী সাহেবকে সাতশ রুপি দেন। সে যুগে সাতশ রুপি অনেক বড়ো একটি অঙ্ক ছিল। হযরত মৌলভী সাহেব (রা.) মরহুম মিয়াঁ নাজমুদ্দীন সাহেবকে (রা.) গম কেনার জন্য গ্রামে পাঠান। তিনি বলেন, তার সাথে মির্যা ইসমাঈল সাহেবও যান। শস্য কেনা হয় আর বিকানীর থেকে, যা ভারতের রাজস্থান রাজ্যের একটি অঞ্চল, সেখান থেকে মানুষজন বাস্তুচ্যুত হয়ে আমাদের এলাকায় চলে আসে। সেখানে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তাই সেখান থেকে লোকেরা চলে এসেছিল এবং চারদিক থেকে শুধু রুটির জন্য হাহাকার শোনা যেত। হুযূর (আ.) নির্দেশ দেন, লঙ্গারে যেন সারাক্ষণ আটা প্রস্তুত থাকে এবং রুটি তৈরি থাকে। তিনি মিয়াঁ নাজমুদ্দীন সাহেবকে (রা.) বলেন, যে-ই রুটি চাইবে তাকে যেন রুটি দেওয়া হয় এবং কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই কেনা শস্য শেষ হয়ে যায়। তখন হুযূর (আ.) একটি ভাষণ দেন, যার কথাগুলো এমন ছিল- এটি সাময়িক ব্যাপার; সব সময় এমন কুরবানী দিতেও হয় না, আর এমন পুরস্কার সব সময় পাওয়াও যায় না। এগুলো মু'মিনদের জন্য বিশেষ দিন। আল্লাহ্ তা'লা বন্ধুদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের তৌফিক দান করুন। এই ভাষণের ফলে কিছু অর্থ সংগ্রহ হয় এবং বাইরে থেকেও কিছু আসে, আর শস্য কেনা হয়। মোটকথা দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে এই ধারা অব্যাহত থাকে। দুর্ভিক্ষকবলিত যারা আসত তাদেরকে সাথে সাথে খাবার দেওয়া হতো এবং হুযূর (আ.) বলতেন, আমি অমুক পত্রিকায় দেখেছি, কোনো এক দেশে এত শিশু অনাহারে মারা গেছে এবং এত মানুষ মারা গেছে। শস্য পাওয়া যাচ্ছে না; শস্য না পাওয়াটা আল্লাহ্ তা'লার এক কঠিন আযাব এবং ঐশী ক্রোধ। তিনি বার বার উল্লেখ করতেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন রহম করেন এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে মিয়াঁ নাজমুদ্দীন ও মৌলভী সাহেবের কাছে শস্যের বিষয়ে জানতে চাইতেন ও আলোচনা করতেন। [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৭২-৭৩]

আজকালও পৃথিবীর কিছু দেশে এমন অবস্থা বিরাজ করছে। অত্যন্ত কঠিন অবস্থা; দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে না বা এত দাম যে, মানুষ কিনতে পারছে না, আর দারিদ্র্য ও অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, যেখানেই এমন খবর পাওয়া যায়, জামা'ত তাদের সাহায্যের জন্য অর্থ পাঠায় এবং তাদের প্রয়োজন মেটায়, আর এতে মানুষজনও নিজের অঙ্ক দান করে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আরও তৌফিক দিন যেন তারা এসব গরিব এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাহায্যে আরও চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

হযরত কাজী নূর মুহাম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, খলীফাতুল মসীহ্ সানীর যুগে তিনি এই বিষয়টি বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, খাকসার হযরত আমীরুল মু'মিনীনের সাথে- যিনি আমার সহপাঠী ছিলেন- দারুল মসীহ্‌তে রাতে পড়াশোনা করার সৌভাগ্য লাভ করত। হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) আমাদের পড়াতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নারীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক ভাষণ দিতেন। তখন তো সেসব ভাষণের শব্দ আমাদের কান পর্যন্ত ভালোভাবে পৌঁছাত, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, তার কিছুই এখন মনে নেই। লঙ্গারের আটার জন্য সাধারণত মোল্লা আহমদ নূর যেতেন এবং গাধার পিঠে করে যখন আটা আনা হতো, তখন আল্লাহ্ তা'লা খাকসারকেও আটার বস্তা উঠিয়ে দারুল মসীহ্‌তে পৌঁছে দেবার সুযোগ দান করতেন। তিনি বলেন, আমি একবার হুযূর (আ.)-কে দেখলাম, তিনি তাঁর জামার আঁচলে করে অনেক রুপি নিয়ে আসেন এবং না গুনেই মোল্লা আহমদ নূরের আঁচলে তা ঢেলে দেন। তিনি না গুনেই টাকা দিয়ে দেন যে, যাও, যেহেতু লঙ্গারখানার বিষয়াদি পরিচালনা করতে হবে, আরও জিনিসপত্র কিনে আনো যেন লঙ্গারের ব্যবস্থাপনা চলতে থাকে। [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৫]

হযরত মিয়াঁ চেরাগ দীন সাহেব বর্ণনা করেন, একবারের ঘটনা, আমার গলা এমনভাবে বন্ধ হয় যে, আওয়াজ বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবকে বলেন, চেরাগের গলার চিকিৎসা করুন। কী কারণে তার আওয়াজ বের হচ্ছে না? হযরত মৌলবী সাহেব চিকিৎসা করতে থাকেন, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। তারপর এক উপলক্ষ্যে ডা. মুহাম্মদ হুসাইন শাহ সাহেব, ডা. ইয়াকুব বেগ সাহেব এবং লাহোরের ডা. বুঢ়ে খান সাহেব যখন একত্রিত হন, তখন তাদের সামনেও হুযূর এই বিষয়টি উল্লেখ করেন যে, কী কারণে ছেলেটির আওয়াজ বন্ধ হয়ে আছে। এর প্রেক্ষিতে ডা. ইয়াকুব বেগ সাহেব আমার গলা দেখে বলেন, হুযূর যদি নির্দেশ দেন তবে এর গলা ভেতর থেকে কেটে ফেলা হোক; অর্থাৎ মনে হচ্ছে টনসিলের কারণে এমনটি হয়েছে এবং এমনটি করলে কণ্ঠ খুলে যাবে। হুযূর (আ.) এর উত্তরে কিছুই বলেন নি এবং চুপ থাকেন। তিনি বলেন, এরপর কয়েকদিন পর হুযূর বলেন, চেরাগ, এখন আমি তোমার চিকিৎসা করব। আর তিনি তখনই দেখে বলেন, আমি তোমার জন্য ব্যবস্থাপত্র তৈরি করব। খোদার প্রজ্ঞার কী মাহাত্ম্য! সেদিনই অমৃতসরের এক ভেষজ ঔষধ বিক্রেতা আকন্দ পাতার আচারের একটি বয়াম নিয়ে আসে। হুযূর তা খুলে দেখেন এবং বলেন, এটিই তোমার চিকিৎসা। তিনি যে পূর্বে বলেছিলেন ব্যবস্থাপত্র তৈরি করবেন, এরপর ঠিক সেরকমই ব্যবস্থাপত্র তৈরিকারী বা আচার জাতীয় জিনিস প্রস্তুতকারী একজন, যে হেকিমির কাজও করত, সে আকন্দ পাতার সেই আচার নিয়ে আসে; তখন হুযূর (আ.) বলেন, এটিই তোমার চিকিৎসা। খাওয়ার সময় রুটির ওপর দুই-তিনটি পাতা রেখে আমাকে দিয়ে দিতেন। সেটি খুবই মজাদার ছিল এবং হুযূর নিজেও তা চেখে দেখেছিলেন। তিনি বলেন, এতে আমার রোগ প্রশমিত হয়। এর প্রেক্ষিতে হুযূর পুরো বয়ামটিই আমাকে দিয়ে দেন যেন আমি তা খাই। সুতরাং আমি তা খাই এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই।"
[আসহাবে আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭২]

হযরত মির্যা আফযাল বেগ সাহেব বর্ণনা করেন, আমি কাদিয়ানে প্রথমবার ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আসি। এখানে পিতা-পুত্র উভয়ের নামই আফযাল বেগ লেখা হয়েছে; মনে হচ্ছে নাম ভুল হয়েছে। যাহোক তিনি বলেন, আমার পিতা যিনি আদালতের মোক্তার ছিলেন, শিক্ষা অর্জনের জন্য আমাকে তালীমুল ইসলাম হাই স্কুলে ভর্তি করে দেন, বোর্ডিংয়ে আরও কয়েকজন ছাত্র ছিল। সেসময় বোর্ডিংয়ের ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা লঙ্গারের খাবারের সাথেই ছিল। খাবার সংক্রান্ত কিছু অভিযোগ দেখা দিলে আমার পিতা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে উল্লেখ করেন, বাচ্চাদের খাবারের কষ্ট হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে হুযূর অত্যন্ত স্নেহপরবশ হয়ে বলেন, বাচ্চারা এখন থেকে বাড়ি থেকে খাবার পাবে। আর এভাবেই কয়েক মাস পর্যন্ত হুযূরের নিজের ঘর থেকে আমাদের কাছে খাবার আসতে থাকে এবং মাঝে মাঝে হুযূর ঘর থেকে আম ও মিষ্টি ইত্যাদিও খাওয়ার জন্য পাঠাতেন।" [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:১৬৭]

খাজা আব্দুর রহমান কাশ্মীরী সাহেব হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে জানান, মরহুম হাফেয হামেদ আলী সাহেব তার কাছে বর্ণনা করেছেন, যখন হুযূরের কাছে কোনো জায়গা থেকে টাকা আসত, তখন হুযূর আমাকে ডেকে নিতেন এবং না গুনেই টাকা দিয়ে দিতেন আর বলতেন, এখন টাকা নিয়ে নাও, কে জানে আবার কবে হাতে আসবে!

খাকসার নিবেদন করে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, মরহুম হাফেয হামেদ আলী সাহেব হযরত সাহেবের বিশেষ সেবক ছিলেন, যাকে হযরত সাহেব ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য টাকা দিতেন।" [সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃ: ৫২৯-৫৩০]

হযরত খান সাহেব সৈয়দ গোলাম হুসাইন সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হুযূর আমাকে কাদিয়ান থেকে পাঠালেন ও বললেন, বাটালা থেকে রেলের একটি পার্সেল এসেছে; সেটি নিয়ে আসো। আর তিনি আমাকে পাঁচ রুপিও দেন। ট্রেনে করে পার্সেল এসেছে; সেটি বাটালা থেকে নিয়ে আসো। পার্সেলটি ছিল আঙুরের একটি ঝুড়ি, যার জন্য মাত্র চার আনা খরচ লেগেছিল। আমি যখন সেই ঝুড়িটি এনে উপস্থিত করি তখন হুযূর ঝুড়ির চট ছিঁড়ে দুই হাতে আঙুর বের করে প্রথমে আমাকে দেন আর বলেন, এটি আপনার অংশ।

আমি অবশিষ্ট পৌনে পাঁচ রুপি ফেরত দিতে চাইলাম, তখন হুযূর একথা বলে ঝুড়িটি উঠিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন যে, আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে হিসাব রাখি না। তিনি বলেন, সেসময় আমার বয়স পনেরো বছর ছিল।

[আসহাবে আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২০]

হযরত মুন্সী কাজী মাহবুব আলম সাহেব বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং খাজা কামালুদ্দীন সাহেব পেশোয়ারে একত্রে ওকালতি করতেন। দুইজন অংশীদার ছিলেন, অর্থাৎ তাদের যৌথ আইন ব্যাবসা ছিল। মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব কাদিয়ানে চলে আসেন, তবে খাজা সাহেব সেখানেই থেকে যান। হযরত সাহেবের (আ.) ওপর যে মামলাগুলো ছিল- সম্ভবত তা করম দীনের মামলার বিষয় হবে- সেগুলোর তদারকির জন্য খাজা সাহেব পেশোয়ার থেকে আসেন। হযরত আকদাস (আ.) মসজিদে মুবারকে আসেন। খাজা সাহেব একেবারে কান্না-কান্না চেহারায় নিবেদন করেন, হুযূর! আল্লাহ্ এবং রসূলই জানেন, আমি কীভাবে এখানে পৌঁছেছি! স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে ভাড়ার জন্য টাকা জোগাড় করে আমি এখান পর্যন্ত পৌঁছেছি। আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। হযরত সাহেব বলেন, খাজা সাহেব, আপনার কি টাকা প্রয়োজন? আসুন! এরপর হযরত সাহেব ভেতরে যান এবং খাজা সাহেবও সাথে যান। তিনি একটি ট্রাংক খোলেন; তাতে সম্ভবত কয়েন ছিল; তিনি (আ.) হাত ভরে দুই-তিন আঁজলা খাজা সাহেবের ঝুলিতে ঢেলে দেন এবং বলেন, খাজা সাহেব, এতটুকু যথেষ্ট নাকি আরও প্রয়োজন? খাজা সাহেব বলেন, যথেষ্ট হুযূর! এখন তো অনেক হয়ে গেছে। খাজা সাহেব পরবর্তীতে মসজিদে মুবারকে সেই টাকাগুলো গুনে দেখেন- তা প্রায় তিনশ রুপি ছিল। খাজা সাহেব পরদিন গুরুদাসপুর চলে যান। হযরত সাহেব সেই টাকা না গুনেই তাঁর ঝুলিতে ঢেলেছিলেন এবং হযরত সাহেবের এটি সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, তিনি খাদেমদেরকেও টাকা গুনে দিতেন না, পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতেন। যতটুকু সময় আমার থাকার সুযোগ হয়েছে, হযরত সাহেব কখনো কোনো খাদেমের কাছ থেকে হিসেব চান নি; বরং যখনই কেউ চাইত, হযরত সাহেব তাকে দিয়ে দিতেন। [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৭]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব খাজা সাহেবের প্রতি স্নেহের এই উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন, খাজা কামালুদ্দীন সাহেব, যিনি আজ জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, অর্থাৎ জামা'ত থেকে আলাদা হয়ে গেছেন এবং অনুগ্রহকারী পিতার সন্তানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করেন; অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন আর তাঁর সন্তান হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর সাথে তার শত্রুতা রয়েছে; তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃপা, অনুগ্রহ এবং দানশীলতার ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা রাখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কৃপার তো তার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি অসংখ্যবার টাকা নিয়েছেন এবং নেবার পরও কখনো স্বীকার করেন নি, কখনো নেবার পরও কাউকে জানান নি কিংবা অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন নি, বরং নিজের সেবার বড়াই করতে থেকেছেন। বরাবর এটাই বলেছেন যে, আমি জামা'তের অনেক বড়ো সেবা করছি। তিনি লেখেন, আমি একে উপকারকারীর প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ অস্বীকার করা বলে মনে করি। গুরুদাসপুরে যখন মৌলভী করম দীনের মামলাগুলো চলছিল, তখন একবার মামলা চলাকালীন তিনি হুযূরকে (আ.) একটি চিঠি দেখান যা তার বাড়ি পেশোয়ার থেকে এসেছিল এবং তাতে খরচের সংকটের কথা উল্লেখ ছিল। হুযূর (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে তাকে নগদ পাঁচশ রুপি দিয়ে দেন এবং তিনি বলেন, এরপর মাসিক একশ রুপি দিতে থাকেন। অর্থাৎ এরপর তিনি (আ.) মাসিক একশ রুপি করে দিতে থাকেন। বিশেষভাবে বন্ধুগণ হুযূরের (আ.) আহ্বানে মামলার খরচের জন্য অনেক বড়ো অঙ্কের টাকা পাঠিয়েছিলেন যা খাজা সাহেবের কাছে থাকত। হযরত সাহেব কখনো হিসাব চান নি। এ ধরনের আর্থিক সদাচরণ এবং দান ছাড়াও হযরত সাহেবযাদা শহীদ আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য একটি মূল্যবান কোট নিয়ে এসেছিলেন যা আফগানি ধাঁচের ছিল। খাজা সাহেব একথা বলে তা চেয়ে নেন যে, হুযূর, এই কোটটি আমাকে প্রদান করুন যেন আমি এটি পরে আদালতে প্রবেশ করতে পারি এবং এর বরকতে বিরোধী পক্ষের উকিল এবং আদালতে আমার প্রভাব থাকে। হুযূর হেসে এই কারুকাজ করা মূল্যবান চোগাটি খাজা সাহেবকে দিয়ে দেন।" [সীরাত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা-শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১১-৩১২]

গত খুতবাতেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তিনি উন্নতমানের চামড়ার তৈরি একটি কোট এনেছিলেন। আজকালও লেদারের যে-সব পোশাক রয়েছে সেগুলো অনেক মূল্যবান মনে করা হয়, সে যুগেও তা-ই ছিল। সেই কোটটিও তিনি খাজা সাহেবের চাওয়ার পর তাকে দিয়ে দেন।

শেখ হামেদ আলী সাহেব বর্ণনা করেন, শেষ বয়স পর্যন্ত আমার কাছে কখনও হিসাব চান নি এবং কখনও অসন্তুষ্টও হন নি। বরং একবার আমি লাহোর যাই; মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব সাতশ রুপির হুন্ডি পাঠিয়েছিলেন, আমি তা নিয়ে আসি। টাকা ছিল, কোনো মানি অর্ডার বা ভাউচার জাতীয় কিছু ছিল। কিছু জিনিসপত্র আনি, মালপত্রও কিনি। প্রায় পঞ্চাশ রুপি ফেরত আনি। মালপত্র কেনার পর তা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। আমি এর হিসাব হযরত সাহেবকে দেই। তিনি বলেন, আমি কবে হিসাব চেয়েছি?" [সীরাত আহমদ, কুদরাতুল্লাহ্ সানোরী সাহেব, পৃ: ৫৯]

হযরত শেখ আহমদ দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই অধমকে নির্দেশ দেন, তুমি অমৃতসরে মিয়াঁ নবী বখশ সাহেব রফুগরের কাছে যাও; আর সাথে একটি চিঠি লিখে দিয়ে বলেন, এটি তাকে দিয়ে দিও। তিনি যে-সব জিনিস কিনে দেবেন তা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে এবং আগামীকালের মাঝে ফিরে আসবে। পরের দিন আমি কিছুটা দেরিতে পৌঁছি। হুযূরের একজন সেবক ছিলেন মিয়াঁ করমদাদ সাহেব। তিনি (আ.) তাকে নির্দেশ দেন, তাড়াতাড়ি যাও; আহমদ দ্বীনকে অমৃতসরে পাঠিয়েছিলাম, সে এখনও ফিরে আসে নি; সব ঠিক আছে কি না খোঁজ নাও। রাস্তায় মিয়াঁ করমদাদ সাহেব আমাকে পেয়ে যান। তিনি বলতে থাকেন, হযরত সাহেব তোমার জন্য অনেক চিন্তা করছেন। আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে পৌঁছি, তখন শুরুতেই হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার কোনো কষ্ট হয় নি তো? আমি নিবেদন করি, হুযূর, কোনো কষ্ট হয় নি। এভাবে আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করায় আমার মন আনন্দে ভরে যায় যে, তিনি আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেছেন। আমি একটি হিসাবের কাগজ এবং কিছু টাকা ফেরত দিতে চাইলে হুযূর (আ.) বলেন, এটি কীসের কাগজ? আমি বিনম্রতার সাথে নিবেদন করি, এই জিনিসগুলোর হিসাব এবং এই টাকাগুলো বাকি আছে। অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে তিনি (আ.) বলেন, আমার আর তোমার আবার কীসের হিসাব! এই টাকাগুলো তুমি তোমার প্রয়োজনে খরচ কোরো। আমি অনেক খুশি হই।

[আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৫-৯৬]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব লেখেন, হযরত হাকীমুল উম্মত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব একবার তাঁর কাছ থেকে কিছু ধার নিয়েছিলেন। যখন তিনি সেই টাকা হযরতের সমীপে ফেরত পাঠান, তখন হুযূর (আ.) তা অপছন্দ করেন এবং তা ফেরত দিয়ে বলেন, আপনি আমার টাকাকে আপনার টাকা থেকে আলাদা মনে করেন?" [সীরাত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা: হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবই লেখেন, হযরত আকদাস যখন থেকে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হবার ঘোষণা দিয়েছেন এবং মানুষ এটিও জানতে পেরেছে যে, খোদা তা'লা তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছেন- 'বাদশাগণ তোমার কাপড় থেকে বরকত খুঁজবে'- তখন মানুষ সাধারণত তাঁর কাছে কাপড় চাইত এবং তিনি কখনও কাউকে প্রত্যাখ্যান করতেন না। আর মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হতো যে, কেবল তাঁর শরীরে থাকা কাপড়গুলোই অবশিষ্ট থাকত এবং বাকি সব দিয়ে দেওয়া হতো।"

[সীরাত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা: হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯০]

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বলেন, মীর আব্বাস আলী সাহেবের কাছে বারাহীনে আহমদীয়ার যে মূল্য আসত, তা তাকে খরচ করার অনুমতি তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন। এটি প্রশস্ত হৃদয় এবং দানশীলতার একটি সাধারণ প্রমাণ।"

[হায়াতে আহমদ, প্রণেতা- ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, ২য় খণ্ড, পৃ:২০০]

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বলেন, "মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেব এবং মির্যা ইমামুদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চরম বিরোধী ছিলেন; অনেক বিরোধী ছিলেন, তারা দুইজন আত্মীয়ও ছিলেন কিন্তু বিরোধী ছিলেন; তা সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় তারা যখনই কোনো কিছু চাইতেন, হুযূর তা পূর্ণ করে দিতেন। তিনি বলেন, একবার আমার সামনে মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেব হুযূরের কাছে পঞ্চাশ রুপি বা কমবেশি কিছু চেয়েছিলেন এবং হুযূর সাথে সাথে হাফেয হামেদ আলীর হাতে তা পাঠিয়ে দেন।" [আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৫-২১৬]

শেষাংশ ১৩ পাতায়....

তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহ

[দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব] হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রা.)

প্রথম উদাহরণ

একবার হযরত আমীরুল মুমিনীন, আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয (বর্ণনাকারীর মন্তব্য: হযরত খলীফাতুল মসীহ দ্বিতীয় রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাশ্মীর সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে ভালুক শিকারের লাইসেন্স ছিল। সফরের সময় তিনি এমন এক স্থানে অবস্থান করেন যেখানে আহমদিদের বসতি ছিল। সেখানে হুযূর শিকারের উদ্দেশ্যে একটি পাহাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করেন। লোকেরা পশু তাড়ানো শুরু করল। এমন সময় একটি কস্তুরী হরিণ তাড়ার মুখ থেকে বেরিয়ে এসে ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে গেল। হুযুরের কাঁধে রাইফেল ছিল এবং নলটি হরিণের দিকেই তাক করা ছিল। সঙ্গীরা অস্থির হয়ে উঠলেন যে এমন বিরল ও চমৎকার শিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তবুও কেন গুলি করা হচ্ছে না। হুযূর সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল নিচে নামিয়ে ফেললেন। হরিণটি দৌড়ে চলে গেল। তিনি বললেন, এর জন্য বিশেষ লাইসেন্স না থাকায় আমার পক্ষে এটিকে গুলি করা বৈধ ছিল না।

বাড়ি ফিরে সঙ্গীদের কেউ কেউ বললেন, কী অসাধারণ শিকার সামনে এসেছিল! আমরা হলে এমন শিকার কখনোই ছেড়ে দিতাম না। যদি এভাবে এত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাহলে আর শিকারই করা যাবে না। কিন্তু তারা জানতেন না যে, যদি এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন না করা হয়, তাহলে তাকওয়াই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ

আমার এক বয়োজ্যেষ্ঠের কাছে ধীরে ধীরে প্রায় নব্বইটি জাল বা অচল রুপার মুদ্রা জমে গিয়েছিল। এর মধ্যে কিছু মুদ্রায় কিছুটা রুপা থাকায় সেগুলো বিক্রি করা যেত, আর কিছু ছিল সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও মূল্যহীন। তিনি মূল্যহীনগুলো সব একটি পুকুরে ফেলে দিলেন। আর যেগুলো বিক্রিযোগ্য ছিল, সেগুলো বিক্রির জন্য পাঠালেন এবং যিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁকে বলে দিলেন, যেন কোনো স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করে তাঁর সামনেই সেগুলো কেটে ফেলা হয়, যাতে পরে আর মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা না যায়।

স্বর্ণকার এ শর্ত মেনে সেগুলো কিনে নিল এবং নির্ধারিত মূল্যও পরিশোধ করল। কিন্তু যখন তাঁর কর্মচারী মুদ্রাগুলো কাটতে বলল, তখন স্বর্ণকার ঝগড়া শুরু করল। সে বলল, আমি যখন এগুলো কিনেই নিয়েছি, তখন এখন তোমার কী? আমি এগুলো অক্ষত অবস্থাতেই বিক্রি করে দেব। কিন্তু তিনি এতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত মুদ্রাগুলো ফিরিয়ে নেওয়া হলো। তখন স্বর্ণকার বলল, আচ্ছা, যদি দাম আরও কমিয়ে দাও, তাহলে আমি এগুলো কেটে দেব। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এতে সম্মত হলেন এবং খুব সামান্য মূল্য গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রতিটি মুদ্রা কেটে তবেই ছাড়লেন।

অথচ সাধারণ মানুষ প্রথমে চেষ্টা করে নিজেরাই জাল মুদ্রা চালিয়ে দিতে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে কোনো চালাক লোকের মাধ্যমে বাজারে চালিয়ে দেয়, অথবা কিছু কম দামে দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়, যাতে সে পরে তা চালাতে পারে। আবার কিছু অসাধু লোক তো সব সময় নিজের পকেট বা দোকানে এমন জাল মুদ্রা প্রস্তুত রেখেই দেয়। যখন কোনো সরল গ্রামবাসী কেনাকাটা করতে আসে, তখন তার ভালো মুদ্রা নিয়ে চতুরতার সঙ্গে নিজের জাল মুদ্রাটি তাকে দিয়ে বলে, "ভাই সাহেব, আপনার মুদ্রাটি ঠিক নেই, এটি বদলে দিন।"

এটাই মুত্তাকী ও অমুত্তাকীর মধ্যে পার্থক্য। একজন, নাউযুবিল্লাহ, মনে করে যেন আল্লাহ কিছুই দেখেন না; আর অন্যজন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তিনি সর্বদ্রষ্টা। বলো তো, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অন্ধ মনে করে, সে কি তাঁর সত্তা থেকে কোনো আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভ করতে পারে?

তৃতীয় উদাহরণ

এক ব্যক্তি ডাকযোগে একটি চিঠি পেলেন। ঘটনাক্রমে ডাকঘরের কর্মচারী হয়তো টিকিটে সিল দিতে ভুলে গিয়েছিল, অথবা সিল দিলেও তার কোনো ছাপ পড়েনি। মোটকথা, টিকিটটি সম্পূর্ণ অমোহরিত রয়ে গেল। তাঁর ছেলে টিকিটটি খুলে এনে বলল, "আব্বাজান, দেখুন তো, এই টিকিটটি আবার ব্যবহার করা যেতে পারে।"

তিনি ছেলের কাছ থেকে টিকিটটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, "এখন আমাদের জন্য এই টিকিট দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা বৈধ নয়।"

কোনো অমুত্তাকী ব্যক্তি হলে সে শুধু এই টিকিট ব্যবহার করাকেই বৈধ মনে করত না, বরং এমন চাতুর্যের কথা গর্বের সঙ্গেই বলত।

চতুর্থ উদাহরণ

মুত্তাকী ও অমুত্তাকী-উভয়েই বাজারে, জনপথে ও জনসমাগমে নারীদের প্রতি দৃষ্টি নিচু রাখে। কিন্তু যখন কোনো নির্জন স্থানে এমন একজন নারী মুখ খোলা অবস্থায় অতিক্রম করে, যেখানে দেখার মতো আর কেউ নেই, তখন অমুত্তাকী ব্যক্তি আল্লাহকে উপেক্ষা করে ইচ্ছাকৃতভাবে তার দিকে তাকায়।

কিন্তু মুত্তাকী ব্যক্তি এমন প্রতিটি অবস্থায় আরও দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি সংযম পালন করে। কারণ সে সেখানে শুধু সেই নারীকে একা দেখে না; বরং তার পেছনে আরেক মহান সত্তাকেও উপস্থিত দেখতে পায়, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ।

পঞ্চম উদাহরণ

একজন আহমদী বন্ধু তৃতীয় শ্রেণির কামরায় ভ্রমণ করছিলেন। পথে তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো, যিনি দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণ করছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের কামরায় ডেকে নিলেন এবং তিনি এক-দুটি স্টেশন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণিতেই ভ্রমণ করলেন। এরপর আবার নিজের কামরায় ফিরে এলেন।

ভ্রমণ শেষে তিনি নিজের টিকিট জমা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাড়ি ফিরে হিসাব করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ভাড়ার যে পার্থক্য ঐ দুই স্টেশনের জন্য হয়েছিল, তা নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের এজেন্টের কাছে পাঠিয়ে লিখলেন, "প্রয়োজনবশত আমি দুই স্টেশন পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণ করেছি। এর ভাড়ার পার্থক্য পাঠিয়ে দিলাম।"

মনে রাখা উচিত, তৃতীয় শ্রেণির যাত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ২৫ সেরের বেশি ওজনের মালপত্র ওজন করানো ও ভাড়া প্রদান ছাড়া বহন করে, অথবা স্টেশনমাস্টারের অনুমতি কিংবা প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছাড়াই কৌশলে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে, কিংবা চাতুর্যের সঙ্গে স্টেশনের অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়-এসব কাজ এমন, যা একজন মুত্তাকী ব্যক্তি করতে লজ্জাবোধ করেন।

ষষ্ঠ উদাহরণ

একজন স্কুলশিক্ষক ছিলেন। সরকারি নিয়ম ছিল যে প্রধান শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত টিউশন করা যাবে না। কিন্তু তিনি গোপনে টিউশন করতেন।

একজন কবি, যিনি অন্য কবির কবিতা নিজের গজলে নিজের নামে যুক্ত করে দিতেন।

একজন লেখক, যিনি অন্যের লেখা নিজের রচনায় লেখকের নাম উল্লেখ না করেই অন্তর্ভুক্ত করতেন।

একজন প্রভাবশালী ছাত্র, যিনি বেআইনিভাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কয়েক দিন আগেই জেনে নিতেন।

একজন আইনজীবী, যিনি পূর্ণ পারিশ্রমিক নেওয়ার পরও শুনানির সময় আদালতে উপস্থিত হতেন না।

একজন ডাক্তার, যিনি বিশেষ করে তরুণী নারীদের চিকিৎসার সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে এবং বারবার পরীক্ষা করাকে অপরিহার্য মনে করতেন।

এক ব্যক্তি, যিনি ন্যায্য অধিকার ছাড়াই অন্যের চিঠি পড়ে ফেলতেন।

একজন মোল্লা, যিনি মানুষের সামনে মসজিদে খুব সুন্দরভাবে নামাজ পড়তেন, কিন্তু একা থাকলে সেই মান বজায় রাখতেন না।

একজন পেশাজীবী-যেমন দর্জি, স্বর্ণকার বা কামার-যিনি নির্দিষ্ট সময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সময়মতো কাজ শেষ করতেন না।

একজন কর্মচারী, যিনি বেতন নেওয়ার সময় পুরো টাকার দাবি করতেন, কিন্তু কাজ করার সময় খুঁটিনাটি হিসাব রাখতেন না যে তিনি চুক্তি অনুযায়ী কাজ করছেন কি না, নাকি অবহেলা করছেন।

এমন সব মানুষ দুনিয়াদারদের চোখে যতই চতুর বলে পরিচিত হোক না কেন, আল্লাহর নিকট তারা মুত্তাকী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। প্রকৃত মুত্তাকী সেই ব্যক্তি, যিনি এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপ নেন।

সপ্তম উদাহরণ

যে ব্যক্তি নিজের অন্তরে কামপ্রবণ চিন্তাভাবনাকে স্থান দেয়, গায়র-মাহরাম নারীদের সৌন্দর্য ও রূপে নিজের মনকে নিমগ্ন রাখে, অথবা নিজের বাক্সে সুন্দরী নারীদের ছবি 'শিল্পের ভাণ্ডার' বলে তালাবদ্ধ করে রাখে, কিংবা প্রতিবেশীর গ্রামোফোনে কোনো নারীর গান আনন্দ নিয়ে শোনে, অথবা কোনো প্রয়োজন ছাড়াই সুন্দর চেহারার কিশোরদের সঙ্গ পছন্দ করে, কারণ তাদের সান্নিধ্যে সে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে-এসব এবং এ ধরনের হাজারো বিষয় তাকওয়ার শিকড় কেটে ফেলে, যদিও বর্তমান সভ্যতায় এগুলোকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়।

একইভাবে, যে ব্যক্তি শারীরিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন, যার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, যার কাপড়চোপড় নোংরা থাকে, যে অপবিত্র ছিটা থেকে নিজেকে রক্ষা করে না, দাঁত পরিষ্কার রাখে না, ফলে যার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, অথবা কাঁচা রসুন, পেঁয়াজ, মূলা বা হিং খেয়ে মসজিদে এসে নামাজিদের কষ্ট দেয়-সে প্রশংসার যোগ্য কোনো মুত্তাকী নয়। → শেষাংশ ১৬ পাতায়....

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

শনিবার, অক্টোবর ২০১৩/আমীন অনুষ্ঠান

এরপর হযরত খলিফাতুল মসীহ (আ.) বায়তুল হুদা মসজিদে উপস্থিত হন এবং সেখানে আমীন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

হুজুর আনওয়ার (আ.) নিম্নোক্ত ছেলে ও মেয়েদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের একটি করে আয়াত তিলাওয়াত শোনেন এবং শেষে দোয়া পরিচালনা করেন।

এই সৌভাগ্যবান শিশুদের এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল-

আতফাল: বিলাল আহসান, ত্বাহা আহমদ, রাওয়িল চৌধুরী, ইমরান আহমদ, শাহজাদ আহমদ, ফারান আহমদ, আলী শান, সৈয়দ মুজতবা শাহ, জলিলুর রহমান, রাবীত নিসার এবং জীশান শাহিদ।

নাসেরাত: শাফিয়া রহমান, সাবিহা রহমান, ওয়ারদা আহমদ, আয়েশা চৌধুরী, শায়েস্তা মাহমুদ, নুমুদুস সাহর, মরিয়ম সিন্ধু, জুহা তারিক, সানা তাজ, নাদিয়া মরিয়ম, জারা রহমত, সামাবিয়া নুযহাত এবং শাহনাজ সৈয়দ।

এরপর রাত ৯টায় হুজুর আনওয়ার (আ.) মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করান। নামাজ শেষে তিনি নিজ বাসভবনে ফিরে যান।

রবিবার, ২০ অক্টোবর ২০১৩

ভোর ৫টা ১০ মিনিটে হুজুর আনওয়ার (আ.) বায়তুল হুদা মসজিদে উপস্থিত হয়ে ফজরের নামাজের ইমামতি করেন। নামাজ শেষে তিনি নিজ বাসভবনে ফিরে যান।

সকালে হুজুর (আ.) দাপ্তরিক ডাকপত্র ও বিভিন্ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সাক্ষাৎ

নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ১১টায় হুজুর (আ.) তাঁর অফিসে উপস্থিত হন এবং পরিবারগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ শুরু হয়।

সকালের এই পর্বে মোট ৪৮টি পরিবারের ১৭৯ জন সদস্য তাঁদের প্রিয় ইমামের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এসব পরিবার সিডনির তিনটি জামাআত-মার্সডেন পার্ক (Marsden Park), ব্ল্যাক টাউন (Black Town) এবং মাউন্ট ড্রুইট (Mount Druitt)-থেকে এসেছিলেন।

সকলেই হুজুর (আ.)-এর সঙ্গে স্মারক ছবি তোলেন এবং দোয়ার আবেদন করে তাঁর দোয়া লাভ করেন।

স্নেহবশত হুজুর (আ.) অধ্যয়নরত ছেলে-মেয়েদের কলম উপহার দেন এবং ছোট শিশুদের চকলেট প্রদান করেন।

সাক্ষাৎকারের শেষে অস্ট্রেলিয়ার আমীর ও মুবাল্লিগ-ইনচার্জ মুকাররম মাহমুদ আহমদ শাহিদ সাহেব দাপ্তরিক সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুজুর (আ.)-এর নির্দেশনা গ্রহণ করেন।

এই সাক্ষাৎকারের কর্মসূচি দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত চলে।

এরপর হুজুর (আ.) বায়তুল হুদা মসজিদে গিয়ে যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করান এবং পরে নিজ বাসভবনে ফিরে যান।

খুদ্দামুল আহমদিয়া অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় আমিলার সঙ্গে হুজুরের বৈঠক

সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে হুজুর আনওয়ার (আ.) বায়তুল হুদা মসজিদে উপস্থিত হন। সেখানে নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খুদ্দামুল আহমদিয়া অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় আমিলার সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়। হুজুর (আ.) দোয়া পরিচালনা করেন।

সাধারণ সম্পাদক (মুতামিদ)-এর প্রতি নির্দেশনা

হুজুর (আ.) জিজ্ঞাসা করেন-

* মোট কতটি মজলিস রয়েছে?
* সব মজলিস কি মাসিক রিপোর্ট পাঠায়?
* রিপোর্টগুলোর ওপর মন্তব্য করে আবার সংশ্লিষ্ট মজলিসে পাঠানো হয় কি?

মুতামিদ জানান, ১৩টি মজলিস রয়েছে এবং সবগুলোই নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তারাও রিপোর্টের ওপর মন্তব্য পাঠান।

হুজুর (আ.) বলেন, "সদর খুদ্দামুল আহমদিয়ারও এসব রিপোর্ট পড়া উচিত এবং নিজের মন্তব্য পাঠানো উচিত। তাঁর জানা দরকার মজলিসগুলো কী কাজ করছে এবং কোথায় তাদের কার্যক্রমে বা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে।"

অর্থ বিভাগের রিপোর্ট

প্রথম সহ-সভাপতি ও মুহতামিম মাল জানান-

* বার্ষিক বাজেট ছিল ২,১০,৫৫২ অস্ট্রেলিয়ান ডলার।
* আল্লাহর অনুগ্রহে আদায় হয়েছে ২,১৩,০০০ ডলারেরও বেশি।

হুজুর (আ.)-এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আয়ের তুলনায় অধিকাংশ খুদ্দাম সঠিকভাবে চাঁদা প্রদান করেন। মাত্র প্রায় ৪০ জন এখনো চাঁদা দেন না। তিনি আরও জানান, ৭৭৮ জন খুদ্দাম নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারীর তালিকায় আছেন।

তাজনীদ বিভাগ

মুহতামিম তাজনীদ জানান যে মোট তাজনীদ ৮৩০ জন।

এ বিষয়ে হুজুর (আ.) বলেন, "অর্থাৎ যারা এখনো চাঁদা দেয় না, তারা তাজনীদে অন্তর্ভুক্ত আছে; কিন্তু এখনো চাঁদার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।"

দ্বিতীয় সহ-সভাপতি

তিনি জানান, সদর সাহেব যে দায়িত্ব অর্পণ করেন, তিনি তা পালন করেন। বর্তমানে বিশেষ করে জলসা সালানা এবং হুজুরের সফর-সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন।

খিদমতে খালক বিভাগ

মুহতামিম খিদমতে খালক জানান যে ৩৩৭ জন খুদ্দাম রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে হুজুর (আ.) বলেন, "রক্তদান কর্মসূচি এমনভাবে আয়োজন করুন যাতে প্রতিবেশী ও অন্যান্য অ-আহমদিরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন।"

তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যে এভাবে কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ও মেডিকেল টিমও আসে। এর মাধ্যমে জামাআতের সুন্দর পরিচিতি গড়ে ওঠে।

তিনি আরও বলেন, "খিদমতে খালকের কর্মসূচি শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। অন্যদেরও অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। হাজারো মানুষ অংশ নিক। কর্মসূচি আপনাদেরই হবে, মিডিয়াতেও জামাআতের নাম প্রচার হবে এবং একই সঙ্গে ব্যাপকভাবে আহমদিয়াতের শিক্ষা ও বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।"

তিনি আরও নির্দেশ দেন,"চ্যারিটি ওয়াকেরও আয়োজন করুন এবং সেখানে অ-আহমদিদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন। এতে সমাজে একীভূত হওয়ার (Integration) বিষয়ে যে অভিযোগ তোলা হয়, তারও জবাব দেওয়া যাবে।"

শিক্ষা বিভাগ

মুহতামিম তালিম জানান যে বছরে দুটি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

হুজুর (আ.) নির্দেশ দেন, "পরীক্ষার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোনো গ্রন্থ পাঠ্যসূচিতে রাখুন। যারা ইংরেজিভাষী, তাদের জন্য ইংরেজি অনুবাদ ব্যবহার করুন। যদি বই বড় হয়, তবে দুই-তিন ভাগে ভাগ করে নিন। নতুন প্রজন্ম ইংরেজি জানে। তাদের মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থ অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করুন। পরীক্ষার মাধ্যমে তারা পড়বে এবং ধীরে ধীরে আগ্রহও বাড়বে। একই সঙ্গে চেষ্টা করুন যাতে যত বেশি সম্ভব খুদ্দাম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।"

তারবিয়ত বিভাগ

১১ পাতার পর.....

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন, আরবের আব্দুল মুহয়ী সাহেব একদিন আমার কাছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র যুগের কথা উল্লেখ করে বলেন, হযরত সাহেবের দানশীলতার কথা আর কী বলব! অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দানশীলতার কথা আর কী বলার আছে! তিনি বলেন, তাঁর যুগে আমার কখনও কোনো কষ্ট হয় নি। যখন যে জিনিসের প্রয়োজন হতো, কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই চেয়ে নিতাম এবং হুযুর আমার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি দিতেন আর নিজে থেকেও প্রতিনিয়ত দিতে থাকতেন। হুযুরের যখন ওফাত হয়, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমার প্রয়োজন সেভাবে মেটাতে পারেন নি, যদিও তিনি নিজেও অনেক দানশীল হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে আমি তাঁকে লিখি, আপনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খলীফা তো হয়ে গেছেন, কিন্তু আমার প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন নি। হযরত সাহেব তো আমার সাথে এমন আচরণ করতেন। এর প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমাকে সাহায্য করেন। কিন্তু তিনি বলেন, তবে খোদার কসম! কোথায় হযরত সাহেব আর কোথায় তিনি! তাঁর (আ.) তুলনায় তিনি (রা.) কিছুই নন।" [সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৫]

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরে কোনো এক গরিব নারী কিছু চাল চুরি করে। লোকজন তাকে দেখে ফেলে এবং হইচই আরম্ভ হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন নিজের কক্ষে কাজ করছিলেন। শোরগোল শুনে বাইরে আসেন এবং এই দৃশ্য দেখতে পান যে, দুর্দশাগ্রস্ত এক গরিব নারী দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতে চালের একটি ছোটো পুঁটলি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঘটনা জানতে পারেন এবং সেই গরিব নারীর চেহারা ও অবস্থা দেখে তাঁর মন গলে যায়। তিনি বলেন, একে দেখে ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব মনে হচ্ছে। একে কিছু চাল দিয়ে বিদায় করে দাও; অর্থাৎ আরও দিয়ে দাও এবং খোদা তা'লার সাত্তার তথা দোষত্রুটি গোপন রাখার গুণ অবলম্বন করো।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করে লেখেন, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোনো ত্বরাপরায়ণ ব্যক্তি বলতে পারে, এই বিষয়টি তো চোরকে চুরি করতে আরও দুঃসাহসী করে তুলবে। অর্থাৎ একজন চুরি করেছে, তাকে তিনি আরও দুঃসাহসী করে তুলছেন। কিন্তু জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষ বুঝতে পারবে, জিনিস যেহেতু স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজস্ব ছিল এবং তা নিয়েছিল ক্ষুধার্ত, অনাহারে মৃতপ্রায় হতদরিদ্র একজন নারী, সেহেতু এটি চুরি করাকে সহায়তা-সমর্থন প্রদান নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে এটি দরিদ্রকে আহার প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসসমূহ থেকে সাব্যস্ত হয়, মহানবী (সা.)-ও এরূপ পরিস্থিতিতে- যদি চোর নিতান্ত দরিদ্র হয় ও চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় কোনো খাদ্যবস্তু নিয়ে ফেলে- তবে তাকে চোর হিসেবে গণ্য করেন নি, বরং তা উপেক্ষা করেছেন।" [সীরাতে তৈয়্যবা, প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ,পৃ: ৬৪-৬৫]

এ হলো নিজ মনিবের [তথা মহানবী (সা.)-এর] পরিপূর্ণ অনুসরণের দৃষ্টান্ত!

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আবদিকাল মসীহিল মওউদি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। [হে আল্লাহ! আশিস বর্ষণ করো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এবং তোমার দাস মসীহ্ মওউদের প্রতিও এবং (তাদের ওপর) কৃপা ও শান্তিও বর্ষণ করো। [সৌজন্যে: আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৬ শে জুন, ২০২৬]

সীরাত খাতামান নাবীঈন

-মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.(রা.)

আবদুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল

এভাবেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দিনগুলো তাঁর দাদার স্নেহ-ভালোবাসার ছায়ায় অতিবাহিত হচ্ছিল। এমন সময় আব্দুল মুত্তালিবেরও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। যখন তাঁর জানাযা বহন করা হচ্ছিল, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) জানাযার সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন এবং অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন। শৈশবে এটি ছিল তাঁর তৃতীয় বড় শোক। তখন তাঁর বয়স ছিল আট বছর। আর বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, আব্দুল মুত্তালিবের বয়স তখন বিরানব্বই বছর থেকে একশত চল্লিশ বছরের মধ্যে ছিল।

আব্দুল মুত্তালিবের বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে একাধিক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিক পরিচিত ছিলেন- হারিস, যুবাইর, আবু তালিব, আবু লাহাব, আবদুল্লাহ, আব্বাস এবং হামযা। এদের মধ্যে আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ একই মায়ের সন্তান ছিলেন। সম্ভবত এই আত্মীয়তার কারণেই মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিব মহানবী (সা.)-কে আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য তাঁকে অসিয়ত করেন।

ফলে সেই সময় থেকে মহানবী (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে বসবাস করতে শুরু করেন।

কওমের দায়িত্বগুলোর মধ্যে সিকায়াহ (হজযাত্রীদের পানির ব্যবস্থা করা) এবং রিফাদাহ (হজযাত্রীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা)-এই দুইটি দায়িত্ব আবদুল মুত্তালিবের ওপর ন্যস্ত ছিল। মৃত্যুর আগে তিনি জীবিত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবাইরের হাতে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু এই কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো। তাই যুবাইর নিজের সামর্থ্যের বাইরে মনে করে উভয় দায়িত্ব আবু তালিবের হাতে তুলে দেন।

কিন্তু আবু তালিবও ছিলেন আর্থিকভাবে অসচ্ছল। ফলে রিফাদাহ-এর দায়িত্ব বানু নওফল গোত্রের কাছে চলে যায় এবং সিকায়াহ-এর দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আবু তালিব তাঁর তুলনামূলকভাবে ধনী ভাই আব্বাসের হাতে অর্পণ করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবদুল মুত্তালিব জীবিত থাকা পর্যন্ত বানু হাশিম ছিল অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ বংশ এবং কুরাইশের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বানু হাশিমে এমন কোনো ব্যক্তি আবির্ভূত হননি, যিনি সেই সম্মান ও নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন। ফলে কুরাইশদের সার্বিক নেতৃত্ব তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী বানু উমাইয়া ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আবু তালিবের অভিভাবকত্ব

আবু তালিব তাঁর পিতার অসিয়ত অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করেন। তিনি নিজের সন্তানদের চেয়েও মহানবী (সা.)-কে অধিক ভালোবাসতেন। সর্বদা তাঁকে নিজের চোখের সামনে রাখতেন এবং রাতেও সাধারণত নিজের পাশেই শুইয়ে রাখতেন।

সিরিয়া সফর ও বাহীরা যাজকের ঘটনা

যখন মহানবী (সা.)-এর বয়স বারো বছর হলো, তখন আবু তালিব একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে শাম (সিরিয়া) সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু সফরটি ছিল দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য, তাই তিনি প্রথমে ইচ্ছা করেছিলেন যে, মহানবী (সা.)-কে মক্কাতেই রেখে যাবেন।

কিন্তু আবু তালিবের বিচ্ছেদ মহানবী (সা.)-এর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। তাই যাত্রার সময় গভীর ভালোবাসার আবেগে তিনি আবু তালিবকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে আবু তালিবের হৃদয় গলে গেল এবং তিনি তাঁকে নিজের সঙ্গেই সফরে নিয়ে গেলেন।

সিরিয়া দক্ষিণাঞ্চলে বুসরা নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান রয়েছে। কাফেলা সেখানে পৌঁছালে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। সেখানে বাহীরা নামে একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক বাস করতেন। কুরাইশদের কাফেলা তাঁর আশ্রমের নিকটে পৌঁছলে তিনি দেখলেন যে, সমস্ত পাথর, গাছপালা ইত্যাদি হঠাৎ সিজদায় নত হয়ে গেছে।

ঐশী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে তিনি জানতেন যে, একজন মহান নবী আবির্ভূত হবেন। তাই নিজের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেই প্রতিশ্রুত নবী এই কাফেলার মধ্যেই উপস্থিত আছেন। এরপর তিনি নিজের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে চিনে ফেলেন এবং এ বিষয়ে আবু তালিবকে অবহিত করেন। পাশাপাশি তিনি আবু তালিবকে উপদেশ দেন যে, তিনি যেন মহানবী (সা.)-কে আহলে কিতাবের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখেন।

রেওয়ায়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনার সনদ দুর্বল। তবে যদি বাস্তবেই এমন ঘটনা ঘটে থাকে, তবুও এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। গাছপালা ইত্যাদির সিজদা করাকে বাহীরা ধর্মযাজকের একটি কাশফী (আধ্যাত্মিক) দর্শন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়।

ইসলাম কি খ্রিস্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিয়র (Muir) সাহেব এবং আরও কয়েকজন অমুসলিম ঐতিহাসিক বাহীরা রাহিবের ঘটনা এবং এ ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনার ভিত্তিতে-যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, নবুওয়তের দাবির পূর্বে মহানবী (সা.)-এর কোনো খ্রিস্টানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল-এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মহানবী (সা.) নাকি খ্রিস্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নবুওয়তের দাবি করেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা সেই প্রভাবেরই ফল ছিল।

কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং বাস্তবতার পরিপন্থী। যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও জীবনচরিত সম্পর্কে সামান্যও অধ্যয়ন করেছেন এবং যার দৃষ্টিকে পক্ষপাত অন্ধ করে দেয়নি, তিনি কখনো এই আপত্তিতে বিভ্রান্ত হতে পারেন না।

নিঃসন্দেহে, প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেই পরিবেশের ভালো-মন্দ থেকে তার মনে বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। সুতরাং, যদি মহানবী (সা.) নবুওয়তের পূর্বে কোনো খ্রিস্টানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকেন এবং খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা শোনার সুযোগ পেয়ে থাকেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই তার ভালো ও মন্দ দিক সম্পর্কে তাঁর মনে কিছু ধারণা বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু এই ধারণা যে, তাঁর নবুওয়ত এবং তাঁর শিক্ষা সেই প্রভাবেরই ফল ছিল-তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।

প্রথমত, নবুওয়তের পূর্বে তাঁর কোনো খ্রিস্টানের সঙ্গে এমন পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ হওয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই, যাতে মনে করা যায় যে, সেই সাক্ষাৎ তাঁর স্বভাব বা চিন্তার ওপর কোনো গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

দ্বিতীয়ত, যদি কল্পনাবশত এমন কোনো প্রভাব ছিলও বলে ধরা হয়, তবে তা নিশ্চয়ই ইতিবাচক ছিল না। কারণ, সকলেই জানেন যে, মহানবী (সা.)-এর আনীত শিক্ষার সঙ্গে প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের অধিকাংশ মৌলিক বিশ্বাসের সুস্পষ্ট ও মৌলিক বিরোধ রয়েছে।

যেমন, প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম মূলত তিনটি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত-

* হযরত ঈসা (আ.)-এর ঐশ্বরিকত্ব,
* ত্রিত্ববাদ (Trinity),
* এবং কাফ্ফারার (Atonement) আকীদা।

কিন্তু একটি শিশুও জানে যে, পবিত্র কুরআনে এই তিনটি মতবাদের বিরুদ্ধেই অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-এর কথিত ঈশ্বরত্ব ও আল্লাহর পুত্র হওয়ার বিশ্বাস সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক বিশ্বাস, যার কারণে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যায়, পৃথিবী ফেটে যায় এবং পর্বতমালা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।

এমন পরিস্থিতিতে ইসলামের শিক্ষাকে খ্রিস্টধর্মের প্রভাবের ফল বলে দাবি করা উন্মাদনাপূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে বিষয়টি অবশিষ্ট থাকে তা হলো, পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা নাসরী (আ.)-এর প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু এটিও উপরোক্ত আপত্তির সমর্থনে কোনো প্রমাণ হতে পারে না।

কারণ, প্রথমত, হযরত ঈসা (আ.)-এর যে প্রশংসা করা হয়েছে, তা একজন আল্লাহর নবী হিসেবে করা হয়েছে; আল্লাহর পুত্র বা খোদা হিসেবে নয়, যা খ্রিস্টধর্মের দাবি।

দ্বিতীয়ত, এই প্রশংসা কেবল হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্যই বিশেষ নয়। কারণ, পবিত্র কুরআন অতীতের সকল নবীরই প্রশংসা করেছে এবং তাঁদেরকে অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধার যোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছে। বরং কুরআন অত্যন্ত জোর দিয়ে এই নীতি উপস্থাপন করেছে যে, পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই আল্লাহর রাসুল আগমন করেছেন। এর ফলে কুরআন মুসলমানদের অন্তরে বিশ্বের সকল জাতির মহাপুরুষদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে।

কিন্তু এটি একটি সুস্পষ্ট সত্য যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্ব এবং খ্রিস্টধর্মের অন্যান্য মৌলিক আকীদাকে ইসলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলাম হযরত ঈসা (আ.)-কে একজন মানব-রাসুলের বেশি কোনো মর্যাদা দেয়নি, যিনি তাঁর জীবনকাল অতিবাহিত করে অন্যান্য রাসুলদের ন্যায় ইন্তেকাল করেছেন।

অতএব, ইসলাম খ্রিস্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে-এই আপত্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। আর যদি বলা হয় যে, খ্রিস্টধর্মের কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা ইসলামেও বিদ্যমান, তাই মনে হতে পারে যে ইসলাম সেগুলো খ্রিস্টধর্ম থেকে গ্রহণ করেছে-তাহলেও এই আপত্তি সম্পূর্ণ অমূলক।

প্রথমত, যখন ইসলাম এবং বর্তমান খ্রিস্টধর্মের বহু মৌলিক শিক্ষা পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তখন কোনো গৌণ বা আংশিক বিষয়ে উভয় শিক্ষার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকাকে কখনোই এ কথার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না যে, একটি শিক্ষা অন্যটি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর একজন মনোনীত রাসুল বলে বিশ্বাস করে এবং নিজেও আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ধর্ম হওয়ার দাবি করে। সুতরাং, একই উৎস থেকে আগত হওয়ার কারণে ইসলাম ও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে কিছু মিল থাকা স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী। কারণ, হেদায়েতের মৌলিক নীতিসমূহ সব যুগে এবং সব জাতির জন্য একই রকম হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, পবিত্র কুরআন নিজেই ঘোষণা করে যে, পূর্ববর্তী সব আসমানী শিক্ষার চিরন্তন সত্যসমূহকে সে নিজের মধ্যে একত্রিত করেছে। যেমন কুরআন ঘোষণা করে: "এর মধ্যে পূর্ববর্তী সব সহীফার স্থায়ী ও চিরন্তন সত্যসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।"

অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকেও খ্রিস্টধর্মের কোনো বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বা একচ্ছত্র বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না।

সীরাতুল মাহদী

-হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ.

{৮৩}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমি নিবেদন করছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সাধারণত সাদা মসলিনের পাগড়ি ব্যবহার করতেন, যা সাধারণত দশ গজ লম্বা হতো। পাগড়ির নিচে তিনি কুলাহের পরিবর্তে নরম ধরনের একটি রুমি টুপি পরতেন। আর ঘরে অনেক সময় পাগড়ি খুলে শুধু টুপিই পরে থাকতেন।

গ্রীষ্মকালে তিনি সাধারণত মসলিনের কুর্তা পরতেন। এর ওপর গরম ওয়েস্টকোট (সদরি) এবং গরম কোট পরতেন। তাঁর পায়জামাও গরম কাপড়ের হতো। এছাড়া তিনি সাধারণত মোজাও পরতেন। বরং শীতকালে কখনও কখনও একসঙ্গে দুই জোড়া মোজা পরতেন। পায়ে তিনি সবসময় দেশি জুতা ব্যবহার করতেন।

আমার শ্রদ্ধেয়া মা আরও বর্ণনা করেছেন যে, যখন থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রোগের আক্রমণ শুরু হয়, তখন থেকেই তিনি শীত -গ্রীষ্ম নির্বিশেষে গরম কাপড় ব্যবহার করতে শুরু করেন। এসব গরম কাপড়ে তাঁর গরমও লাগত এবং কখনও কখনও কষ্টও হতো। কিন্তু একবার এ অভ্যাস শুরু করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি সেটিই অনুসরণ করেন।

শায়খ রহমতুল্লাহ সাহেব গুজরাটি, পরে লাহোরি আহমদি হওয়ার পর থেকে নিয়মিত তাঁর জন্য পোশাক তৈরি করিয়ে আনতেন। হযরত সাহেবের অভ্যাস ছিল, যে ধরনের কাপড়ই কেউ এনে দিত, তিনি সেটিই পরে নিতেন।

একবার একজন ব্যক্তি তাঁর জন্য এক জোড়া গুরগাবি (এক ধরনের জুতা) এনে দিলেন। তিনি তা পরলেন। কিন্তু কোনটি ডান পায়ের আর কোনটি বাঁ পায়ের, তা তাঁর বুঝতে অসুবিধা হতো। অনেকবার তিনি উল্টো পায়ে পরে ফেলতেন। ফলে তাঁর কষ্ট হতো। কখনও কখনও ভুল পায়ে জুতা পরে বিরক্ত হয়ে বলতেন, "এদের কোনো জিনিসই ভালো নয়।"

আমার শ্রদ্ধেয়া মা বলেন, আমি তাঁর সুবিধার জন্য ডান-বাম জুতা চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তবুও তিনি উল্টো পরে ফেলতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই জুতা ব্যবহারই বন্ধ করে দেন।

আমার শ্রদ্ধেয়া মা আরও বলেন, হযরত সাহেব কখনও কখনও ইংরেজি ধাঁচের শার্টের হাতার কাফ সম্পর্কেও একই ধরনের অপছন্দের মন্তব্য করতেন।

আমি নিবেদন করছি, শায়খ রহমতুল্লাহ সাহেব তাঁর জন্য ইংরেজি ধাঁচের গরম শার্ট তৈরি করিয়ে আনতেন। তিনি সেগুলো ব্যবহার করতেন বটে, কিন্তু ইংরেজি ধরনের কাফ পছন্দ করতেন না। কারণ প্রথমত, কাফের বোতাম লাগাতে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। দ্বিতীয়ত, বোতাম খোলা ও লাগানোর ঝামেলাও তাঁর জন্য কঠিন ছিল। কখনও কখনও তিনি বলতেন, "এগুলো কানে ঝুলে থাকে কেন?

আমি নিবেদন করছি, পোশাক সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাধারণ নীতি ছিল, যে ধরনের কাপড় পাওয়া যেত, সেটিই তিনি পরতেন। তবে সাধারণভাবে তিনি ইংরেজি ধাঁচের পোশাক পছন্দ করতেন না। কারণ প্রথমত, তিনি এটিকে নিজের জন্য সরলতার পরিপন্থী মনে করতেন। দ্বিতীয়ত, শরীরকে আঁটসাঁট করে রাখে এমন পোশাক তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

বাড়িতে তাঁর জন্য কেবল মসলিনের কুর্তা এবং পাগড়ি তৈরি করা হতো। বাকি অধিকাংশ পোশাকই তাঁকে উপহার হিসেবে দেওয়া হতো। এ সেবায় শায়খ রহমতুল্লাহ সাহেব লাহোরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

আমি আরও নিবেদন করছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কখনও কখনও কোমরে পটকা (কোমরবন্ধ) ব্যবহার করতেন। আর যখনই তিনি বাড়ির বাইরে যেতেন, অবশ্যই একটি কোট পরতেন। হাতে লাঠি রাখা ছিল তাঁর একটি রীতি।

ওয়ালিদা সাহেবা বর্ণনা করেন, আমি প্রতি বছর হযরত সাহেবের জন্য অর্ধেক থান কাপড় থেকে কুর্তা তৈরি করতাম। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর আমি পুরো এক থান কাপড় থেকে কুর্তা তৈরি করেছিলাম। হযরত সাহেব আমাকে বলেছিলেন, "এতগুলো কুর্তা কী হবে?"কিন্তু আমি তবুও তৈরি করেছিলাম। সেগুলোর মধ্যে অনেক কুর্তাই তিনি পরার আগেই আমার কাছে রয়ে গিয়েছিল।

{৮৪} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমার শ্রদ্ধেয়া মা (রা.) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জুমার দিন সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং কাপড় পরিবর্তন করতেন।

{৮৫}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমার শ্রদ্ধেয়া মা (রা.) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখনই ঘরে মাগরিবের নামাজ পড়াতেন, তখন প্রায়ই সূরা ইউসুফের সেই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন, যাতে এই শব্দগুলো রয়েছে: اِنَّمَآ اَشۡکُوۡا بَثِّیۡ وَحُزۡنِیۡۤ اِلَی اللّٰہِ

"আমি তো আমার দুঃখ-বেদনা ও শোক একমাত্র আল্লাহর কাছেই নিবেদন করি।" (সূরা ইউসুফ: ৮৭)

বিনীত নিবেদনকারী আরজ করেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কণ্ঠে অত্যন্ত গভীর আবেগ ও হৃদয়স্পর্শী বেদনা ছিল এবং তাঁর কিরাআত ছিল অত্যন্ত সুরেলা ও ঢেউ খেলানো।

{৮৬} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হযরত ওয়ালিদা সাহেবা (রা.) আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কখনো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে ইতিকাফে বসতে দেখেননি। বিনীত নিবেদনকারী আরজ করেন যে, মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব সানৌরীও আমাকে একই কথা বর্ণনা করেছেন।

{৮৭}বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সৈয়দ ফজল শাহ সাহেব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এখানে মসজিদ মুবারকে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর নিকটে বসেছিলাম। ভাই আবদুল্লাহ সাহেব সানৌরীও সেখানে ছিলেন এবং আরও কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন।

হযরত সাহেব (আ.) সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। কিন্তু যখনই ভাই আবদুল্লাহ সাহেব কথা বলতেন, তখন হযরত সাহেব (আ.) অন্যদের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতেন।

এতে আমার মনে কিছুটা কষ্ট হয় এবং আমি তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হই। হযরত সাহেব (আ.) আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আমার দিকে ফিরে বললেন, "শাহ সাহেব, আপনি জানেন, তিনি কে?

আমি আরজ করলাম, "জি, হযরত, আমি ভাই আবদুল্লাহ সাহেবকে চিনি।"

তিনি বললেন, "আমাদের নীতি হলো: قدیمان خود را بیفزائے قدر অর্থাৎ, 'যারা প্রবীণ, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করো।' তিনি আপনার চেয়েও আগে থেকে আছেন।"

সৈয়দ ফজল শাহ সাহেব বলতেন, সেই দিন থেকেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনা হতে পারে না; তিনি আমাদের চেয়ে অগ্রগামী।

বিনীত নিবেদনকারী আরজ করেন যে, সৈয়দ ফজল শাহ সাহেব যখন এই ঘটনাটি বর্ণনা করছিলেন, তখন মিয়াঁ আবদুল্লাহ সাহেব সানৌরীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল।

২ পাতার পর .....

তিনি আরও বলেন, "তারা প্রথম তিন খলিফাকেও সঠিক মনে করে না। এসব প্রশ্ন মূলত ফিতনাকারীদের উত্থাপিত। তারা বলে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার আহলে বাইতকে অগ্রাধিকার দাও।' অথচ এর অর্থ ছিল, তোমরা আমার কথাগুলোকে সেই গুরুত্ব দাও, যেমন নিজের নিকট আত্মীয়দের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনো। কিন্তু তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে।"

হুজুর (আ.) আরও বলেন: "কয়েক বছর আগে একটি শিয়া পরিবার আহমদিয়াতের বায়আত করেছে। তারা বলেছিল, 'আহমদি হওয়ার পরই আমরা বুঝতে পেরেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে প্রকৃত ভালোবাসা কী।'"

তিনি বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঘোষণা করেছেন যে, চারজন খলিফাই ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন। আমিও আমার খুতবাগুলোতে বারবার এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

তিনি আরও বলেন, যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থানে থাকতেন। হযরত আলী (রা.) নিজেও বলেছেন, 'আমি এমন বিপজ্জনক স্থানে থাকতাম না।' হুজুর (আ.) বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইয়াযিদ সম্পর্কে 'পালীদ (অপবিত্র)' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে জানার জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ 'ইসলামে মতভেদের সূচনা' পড়তে পারেন। একইভাবে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে তাঁর আরেকটি গ্রন্থও পড়া উচিত।

এরপর প্রশ্ন করা হয়: আমরা কীভাবে জামাআত এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারি?

হুজুর (আ.) উত্তর দিলেন:" গতকালই আমি এর উত্তর দিয়েছি। তোমরা যদি বায়আতের শর্তগুলোর ওপর আমল করো, তবে সেটাই সর্বোত্তম আদর্শ হবে। অনেকেই বলেন, 'আমরা আহমদিদের বাস্তব জীবনযাত্রার আদর্শ দেখে বায়আত করেছি।'" তিনি আরও বলেন, "কিছুদিন আগে আমি 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' বিষয়ে খুতবা দিয়েছিলাম। সেখানেও বলেছি, নিজেদের জীবনে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করো।"

এ সময় হুজুর আনওয়ার (আ.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এক মাওলভী মসজিদে আর্থিক কোরবানির গুরুত্ব নিয়ে ওয়াজ করলেন। তাঁর বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর স্ত্রী নিজের সোনার চুড়ি চাঁদা হিসেবে দিতে চাইলে, সেই মাওলভী বললেন, "আমি তো মানুষের আবেগ জাগানোর জন্য এসব বলেছিলাম; এগুলো আমাদের জন্য ছিল না।"

হুজুর (আ.) বলেন,"যখন মানুষ নিজেরা আমল করে না, তখন তাদের কথার কী প্রভাব থাকবে? অথচ আমাদের জামাআতে প্রত্যেকেই আর্থিক কোরবানি করে। আমিও করি, আপনারাও করেন।"

সবশেষে, হুজুর আকদাস (আ.)-এর এই অনলাইন সাক্ষাতের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে সকল আহমদি, বিশেষ করে খুদ্দামদের প্রতি অনুরোধ করা হয় যে, এম.টি.এ.-এর এই অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনুন এবং অন্যদেরও শুনতে উৎসাহিত করুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন, যেন আমরা আমাদের প্রিয় ইমামের মূল্যবান বাণীগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং আন্তরিকভাবে সেগুলোর ওপর আমল করতে পারি। আমীন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
akhbaarbadarbanglaqdn@gmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 20-27 Aug 2026 Issue No.34-35

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

৮ পাতার পর.....

অষ্টম উদাহরণ

যে ব্যক্তি নিজের দেহকে আল্লাহর আমানত মনে করে না এবং নিজের স্বাস্থ্য ও শক্তিকে দ্বীনের সেবার জন্য সুস্থ রাখার ব্যাপারে উদাসীন থাকে; যে নিয়মিত খাদ্যসংযম মানে না; বৈধ ও হালাল ভোগ-বিলাসে অতিমাত্রায় নিমগ্ন থাকে; সময়ের মতো মূল্যবান সম্পদ অপচয় করে; অতিরিক্ত হাসাহাসি করে; দারিদ্র্য, অসুস্থতা বা যুগের অবস্থা নিয়ে সর্বদা অভিযোগ করতে থাকে; অথবা প্রায়ই বিষণ্ন থাকে এবং সাধারণভাবে জামাআতের প্রতি কুধারণা পোষণ করে; যার স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ; সামান্য কষ্টেই অধৈর্য হয়ে পড়ে; এবং অল্প নিয়ামতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না-সে এখনও তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথ থেকে অনেক দূরে, সূক্ষ্মতর বা সূক্ষ্মতম পথের পরিচিত হওয়া তো দূরের কথা।

নবম উদাহরণ

যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ কেবল এই কারণে পরিত্যাগ করে যে মানুষ সেটিকে খারাপ মনে করে, সে এ ব্যাপারে মুত্তাকী নয়। বরং প্রকৃত মুত্তাকী সে-ই, যে কেবল আল্লাহ তাআলার ভয়ে পাপ থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ এই বিশ্বাসে যে আল্লাহ তাকে দেখছেন; তিনি অন্তরের গোপন বিষয়সমূহও জানেন; তিনিই সর্বাধিক ভালোবাসা ও সম্মানের যোগ্য; এবং তিনিই এই কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। তাই যদি আমি এই কাজ করি, তবে সেই মহিমান্বিত সত্তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাবে। এই বিশ্বাসের কারণে যে ব্যক্তি পাপ থেকে বিরত থাকে, সেই প্রকৃত মুত্তাকী।

পাপকে কেবল পাপ বলে ত্যাগ করা অথবা নেকিকে শুধু নেকি বলে গ্রহণ করা-এটি নাস্তিক ও ইউরোপীয় দার্শনিকদের নীতি, যা কোনো মুসলিম দার্শনিকগ্রহণ করতে পারেন না। একজন মুসলমান যদি পাপ থেকে বাঁচে, তবে তা কেবল আল্লাহর ভয়ে; আর যদি নেক কাজ করে, তবে তা কেবল আল্লাহর ভালোবাসার কারণে-নাস্তিকদের মতো নিজের পার্থিব লাভের জন্য বা নিজের নফসকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা যেমন খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে স্বাদ রেখেছেন, তেমনি নেক কাজের মধ্যেও এক বিশেষ আনন্দ ও তৃপ্তি রেখেছেন।

দশম উদাহরণ

একজন বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি তাঁর বিষয়বস্তু খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করেছেন এবং সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনও করেছেন। কিন্তু শেষে শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন, "সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দ, সময় খুব কম হয়ে গেছে, আমার শরীরও ভালো নেই। তাই আমি বিষয়টি পুরোপুরি প্রস্তুত করতে পারিনি, আর এখনও এর অনেক অংশ বাকি রয়েছে।" অথচ বাস্তবে তাঁর মনে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না এবং তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুতিই নিয়েছিলেন।

একজন সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন মুত্তাকী কখনো এমন কথা বলতে পারেন না। কারণ তিনি এসব কথাকে অসত্য ও অনুচিত মনে করে তা থেকে বিরত থাকবেন।

এগারোতম উদাহরণ

যেহেতু কিছু গুনাহ কেবল অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই নিজের মনে কারও প্রতি গোপন অবজ্ঞা, কুধারণা, শত্রুতা বা ঘৃণা পোষণ করা; কারও শারীরিক ত্রুটি, বংশ, জাতি, জ্ঞান, বুদ্ধি বা সম্পদের স্বল্পতার কারণে তাকে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ মনে করা; কাউকে ক্ষমা করার পরও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা; অমঙ্গলকামিতা, পরনিন্দা বা দোষচর্চা করা; মাঝে মাঝে মানুষের সামনে লোকদেখানো ইবাদত বা সৎকর্ম প্রদর্শন করা; বিদ্রুপ, কষ্ট দেওয়া বা তিরস্কারের ভঙ্গিতে বাহ্যত ভালো কথা বলা; এমন সভায় আগ্রহ অনুভব করা যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলা হয় বা ধর্মকে গোপনে উপহাস করা হয়; জ্ঞানকে নিজের অহংকারের উপায় বানানো; ধর্মের আড়ালে এমন কাজ করা যা একজন মুমিনের মর্যাদার উপযুক্ত নয়-যেমন, নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে কেউ গেলে তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে দুই কদম এগিয়ে গিয়ে এমন জোরে বুকে ঘুষি মারা যে সে তা আজীবন মনে রাখে; নিজের নফসের সব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও অসদাচরণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখা; এবং যে বিষয়ে সামান্যও সন্দেহ থাকে যে তা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতে পারে, তা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে অবহেলা করা-এসবই সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন মুত্তাকীদের মর্যাদার পরিপন্থী।

প্রকৃত উপকারকারীর পছন্দের আচরণ

সম্ভবত কেউ এই কথাগুলো পড়ে হাসবে এবং বলবে, এগুলো তো খুব সাধারণ ও দৈনন্দিন বিষয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত, এগুলোই সেই আচরণ যা প্রকৃত উপকারকারী আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়। এগুলোই সেই তাকওয়া, যার কারণে তাঁর দরবার থেকে মহান পুরস্কার লাভ হয়।

এটিই সেই অবস্থা, যার ফল কখনো ক্ষতির রূপে প্রকাশ পায় না। বরং এমন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাত-উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হয়। কারণ তাকওয়ার ফল কেবল আখিরাতে ক্ষমা ও জান্নাত নয়; দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীর জন্য জ্ঞান, মারিফাত, বিপদ থেকে মুক্তি এবং অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে রিযিকের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে), আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।"

দেখুন, একটি সূক্ষ্ম তাকওয়ার বিনিময়ে কত মহান প্রতিদান লাভ হয়-তার একটি উদাহরণ আপনার সামনে তুলে ধরছি।

একবার কিছু লোকের অনুরোধে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাওলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভীর সঙ্গে একটি নৈতিক বিষয়ে বিতর্ক করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বিতর্ক শুরু হওয়ার আগে তাঁর বক্তব্য ও বিশ্বাস বিস্তারিতভাবে শোনার পর তিনি বললেন, "মাওলভী সাহেবের বক্তব্যে এমন কোনো বাড়াবাড়ি নেই, যা আপত্তির যোগ্য।" অতঃপর তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেই বিতর্ক পরিত্যাগ করলেন।

এর ফলস্বরূপ সেই রাতেই মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে এই বিতর্ক পরিত্যাগের প্রসঙ্গে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন:

"তোমার এই কাজে তোমার প্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন, এবং তিনি তোমাকে এমন বরকত দান করবেন যে, রাজা-বাদশাহরাও তোমার বস্ত্র থেকে বরকত লাভের চেষ্টা করবে।"

সারসংক্ষেপ

সারকথা, পাঠকদের জন্য এখানে কেবল কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে মানুষের প্রতিটি ইচ্ছা ও প্রতিটি কাজের সময় তাকওয়া ও তাকওয়াহীনতার প্রশ্ন সামনে আসে। তখন তাকে নিজের প্রতিটি নড়াচড়া ও স্থিরতার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

এর ফলেই তার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন আসে। সে নিজের মধ্যে এক নতুন জীবনের অনুভূতি লাভ করে। তার পুরোনো সত্তা যেন মৃত্যুবরণ করে এবং তার স্থলে এক নতুন সত্তার জন্ম হয়। আর এটাই তাকওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

শেষে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। বাহ্যিকভাবে যারা আমাদের কাছে নেক ও মুত্তাকী বলে মনে হয়, তারা চার প্রকারের হতে পারে।

প্রথম শ্রেণি হলো প্রতারকদের। তারা প্রকৃতপক্ষে অসৎ, কিন্তু মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণা করার জন্য নেকির ভান করে।

দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা সমাজকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য প্রচলিত নেক কাজ করে। তারা আল্লাহর কাছে নেক নয়; বরং মানুষের কাছে নেক।

তৃতীয় শ্রেণির লোকেরা সত্যিই দ্বীনের জন্য এসেছিল এবং তাদের উদ্দেশ্যও ছিল নেক। কিন্তু পরে যখন তারা ধন-সম্পদ, দুনিয়ার চাকচিক্য, সম্মান ও ভোগ-বিলাসের স্বাদ পেল, তখন শেষ পর্যন্ত তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।

চতুর্থ এবং সত্যিকার অর্থে প্রশংসনীয় ও অনুসরণযোগ্য হলো সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা, যারা কেবল আল্লাহর জন্য নেক হয়েছিল। এরপর তারা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেয়েছিল, আর আল্লাহ তাআলাও তাঁর অনুগ্রহে তাদের সাহায্য করেছিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দেননি, যতক্ষণ না তারা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

অতএব, এদের সঙ্গই গ্রহণ করা উচিত। আর এমন মানুষ হওয়ার জন্য যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, খলীফাতুল মসীহের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে থাকার চেষ্টা করা উচিত, যাতে জীবন্ত আল্লাহর জীবন্ত নিদর্শনসমূহ থেকে কিছু অংশ লাভ করা যায়; ঈমান আরও দৃঢ় হয়; অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়; তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে; এবং মানুষের পরিণতি তার প্রভুর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়। আমীন।

(সূত্র: আল-ফযল, কাদিয়ান, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)

*****

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir